দুর্গ পাহাড়ে বন্দী

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

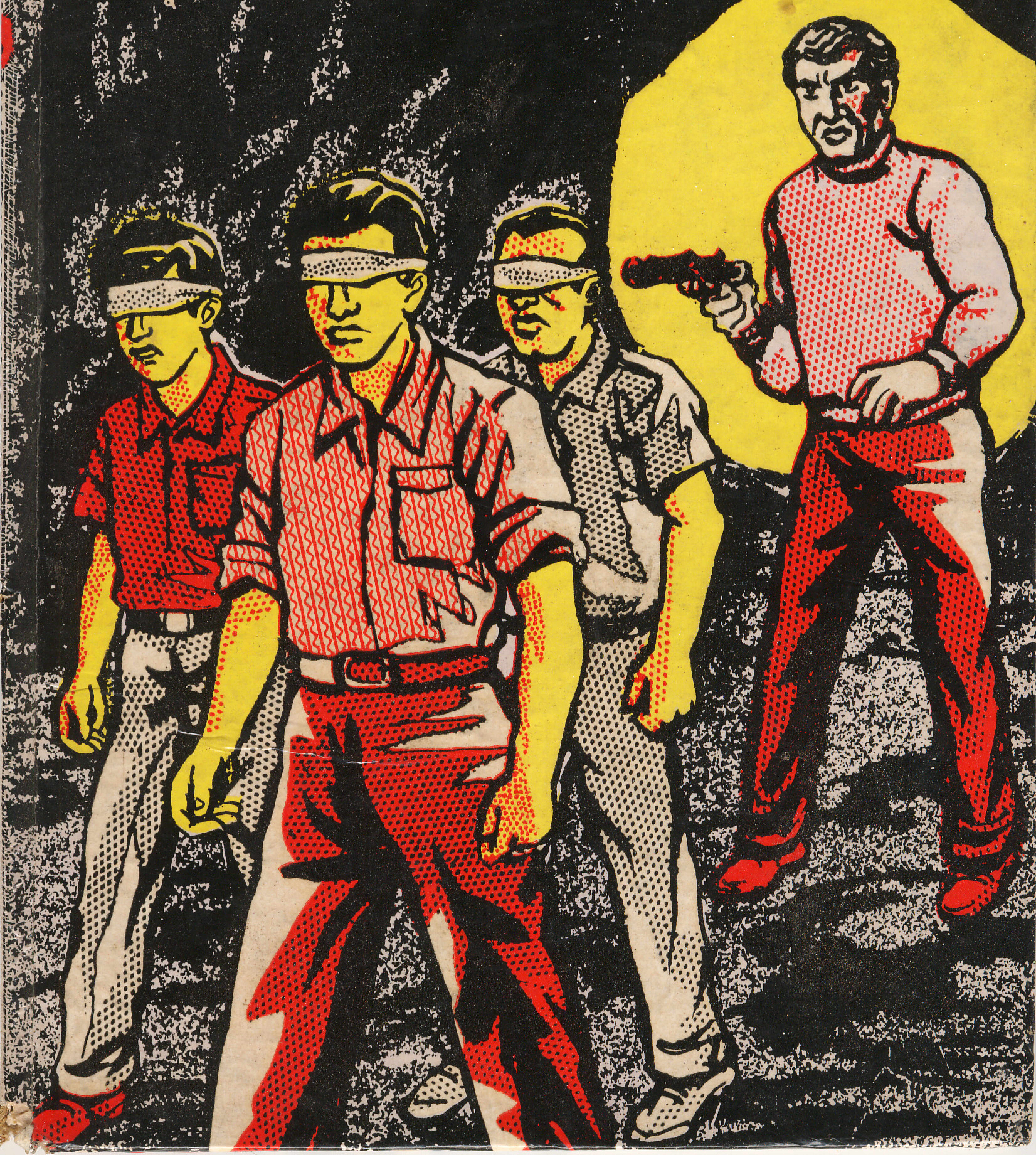

দুর্গপাহাড়ে বন্দী

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

॥ এক ॥

মার্চ মাসের মাঝামাঝি। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। রেজাল্ট বেরোনোর আগে লম্বা অবসর। তখন পড়াশোনার চাপ নেই। তাই সকালবেলা জলখাবার খেয়ে সৃজনকাকার ঘরে বইপত্র ঘাঁটছিলাম। কাকা তখন গম্ভীর মুখে 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়ে যাচ্ছে। আমার দিকে মোটেই নজর নেই। কাকার এই অবহেলাতে আমি মনে মনে খানিকটা ক্ষুব্ধ। তাই আমিও গম্ভীর মুখে 'পপুলার সায়েন্স' নামে একটা আমেরিকান ম্যাগাজিন টেনে নিলাম। কাকার কাছে যে ক'টা ম্যাগাজিন আসে তার মধ্যে এই ম্যাগাজিনটাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে খুব ভালো ভালো লেখা থাকে এতে। যে সংখ্যাটা হাতে নিয়েছিলাম, তার মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার ওপর একটা লেখা ছিল। সেটাই কখন যে মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছি, খেয়াল নেই।

তারপর পড়তে পড়তে এমনই মশগুল যে কাকার ডাক একেবারেই শুনতে পাই নি। কাকা নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমাকে ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিল, 'কি-রে বাদল। তখন থেকে ডেকে মরছি তোকে, শুনতেই পাচ্ছিস না!'

হঠাৎ যেন কাকার কথা শুনতে পেয়েছি, এমনভাবে বললাম, 'বল না, কী বলছিলে?'

'বলছিলাম, আজকের স্টেটস্‌ম্যান দেখেছিস? এই দেখ খবরটা—'

খবর পড়ে আমি তো একেবারে হাঁ। খবরের কাগজের একেবারে পেছনের পাতায় দুই কলম জুড়ে বেশ বড় করে খবরটা দিয়েছে, যদিও খবরটা একটু পুরনো। দিন পনেরো আগে পুরুলিয়া থেকে কলকাতা আসবার পথে উধাও হয়ে গেছেন বিখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানী ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জী।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'সূর্যকাকা!'

'হ্যাঁ। আর কে-ই বা হবে? পুরুলিয়ায় সূর্যই তো আণবিক খনিজের সন্ধান করছিল। তাছাড়া ওই নামে আর কোন আণবিক বিজ্ঞানীর নাম তো জানা নেই। আয়, আমার সঙ্গে।'

বাবার ঘরে গিয়ে ফোন করল কাকা। ওপাশের টেলিফোন বেজে উঠতেই কাকা বলল, 'কে! অনুরাধা! আমি সৃজনদা বলছি। খবরের কাগজে দেখলাম—, এ কি, তুমি কাঁদছ? ঠিক আছে। আসছি আমি—'

একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সৃজনকাকা। আমি বসে বসে স্টেটস্‌ম্যান থেকে খবরটা পড়লাম আবার।

খবরের কাগজের প্রতিবেদন থেকে যা জানা গেল, তা হলো এইঃ ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জী পুরুলিয়া জেলায় তেজস্ক্রিয় খনিজের জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। ও'র ক্যাম্প ছিল বলরামপুর থেকে খানিকটা দূরে তেজকুরি গ্রামে। ঘটনার দিন ভোরবেলা

galporchhabi.blogspot.in

ক্যাম্প থেকে জিপে চেপে পুরুলিয়া শহরে এসেছিলেন কলকাতা যাবার জন্য। বাসের টিকিটও কাটা ছিল আগে থেকে। ড্রাইভার ওঁকে বাস-স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে যায় ক্যাম্পে। কিন্তু তারপর থেকে ডঃ চ্যাটার্জীর খবর আর পাওয়া যায় নি। তিনি কলকাতায় আসেন নি, আবার ক্যাম্পেও ফিরে যান নি। বাড়িতে না ফেরায় ওঁর স্ত্রী অনুরাধা খবর দেন অফিসে। তাঁরা অনেক খোঁজখবর করেও কোন হদিশ পায় না। আজ প্রায় দিন পনেরো হয়ে গেল ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীর কোন খোঁজ-খবর নেই।

খবরটা বারবার পড়েও কিছু হদিশ করতে পারলাম না। সূর্যকাকা সৃজনকাকার কলেজের সহপাঠী। ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করে সূর্যকাকা আণবিক গবেষণা দপ্তরে কাজ নেন। আর কাকা কিছুদিন ভারত সরকারের ভূতাত্ত্বিক দপ্তরে কাজ করলেও ফ্রি-লানসিং করবে বলে চাকরি ছেড়ে দেয় শেষ পর্যন্ত। ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশনের কাজেও দারুণ উৎসাহ কাকার। এসব কাজে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতার পুলিস কমিশনারের সঙ্গে কাকার বন্ধুত্ব হয়েছে। উনি কাকাকে প্রায়ই ডাকেন। শুধু ক্রাইম নয়, বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কাজেও কাকার সমান আগ্রহ। কিছুদিন থেকে কাকা ভাবছিল পুরুলিয়ায় সূর্যকাকার কাছে যাবে। উদ্দেশ্য, তেজস্ক্রিয় খনি অনুসন্ধানের কাজ নিজের চোখে দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। কিন্তু কী দুঃখের কথা! সূর্যকাকা হঠাৎ জঙ্গল থেকে জলজ্যান্ত হারিয়ে গেলেন! কী করে যে অতবড় একজন জলজ্যান্ত মানুষ হারিয়ে গেলেন, তা আমার বুদ্ধির বাইরে। কোন গোপন কাজে নিজেই গেলেন নাকি? অথবা কেউ গায়েব করে নিয়ে গেল ওঁকে? তাও কি সম্ভব?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে কাকার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলাম, এমন সময় কাকা ফিরল। কাকার চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। একেবারে ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা!

চিন্তিত গলায় বললাম, 'এ কি, তোমার এরকম হাল হলো কী করে?'

কাকার গলার স্বরে বিষন্নতা, 'অনুরাধার অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্ট হয়। সঙ্গে এক বছরের বাচ্চা। আর আছে সূর্যপ্রতিমের বুড়ো বাবা আর মা।'

'তাহলে এখন কী হবে?'

অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'দেখি কী করা যায়—'

'ওঁরা পুলিসে খবর দেয় নি?'

'দিয়েছে। পুলিস তার কর্তব্য নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু যা শুনলাম, তাতে বুঝতে পারছি, চক্রান্তের জাল বেশ গভীর। শুধু পুলিসের পক্ষে কতটা কী করা সম্ভব হবে কে জানে?'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আমি বললাম, 'তবে তুমিই কেসটা হাতে নাও না।'

galporchhabi.blogspot.in

তুই ঠিকই বলেছিস বাদল। আমিও সেকথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আমি কি পারব?

'কেন পারবে না? এত দুর্ধর্ষ গুন্ডা বদমাশদের শায়েস্তা করলে তুমি, আর তোমার বন্ধুকে ধরে নিয়ে গেল যারা, তাদের জব্দ করতে পারবে না!'

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র আবেগের বশে আমাকে জড়িয়ে ধরল কাকা।

'ও-কে। তাহলে এবারও তুই আমার সঙ্গে থাকছিস। তোর পরীক্ষাও শেষ। এখন তো ভ্যারান্ডা ভাজা ছাড়া কোন কাজ নেই তোর। কী বলিস!'

এরপর কয়েকদিন কাকা খুব ব্যস্ত থাকল নানা কাজে। একমাত্র সকালবেলা ছাড়া আর সারা দিনে দেখা পাওয়াই মুশকিল। আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'কাকা, আমি তো তোমার সহকারী। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।'

কাকা মুচকি হেসে বলে, 'সে তো নিশ্চয়ই। যখন দরকার হবে, তখন তো নিতে হবেই। এখন বরং এই বইটা পড়।'

কাকা আমাকে যে বইটা পড়তে দিল, সেটার নাম 'ইউরেনিয়াম অ্যান্ড মিরাকল মেটালস'। বইটা দারুণ। অনেক ছবি। পড়তে পড়তে বেশ মন লেগে যায়। বইটা পড়ে জানতে পারলাম, ইউরেনিয়াম ধাতু প্রকৃতিতে কী অবস্থায় পাওয়া যায়, কী করে ভূতাত্ত্বিকরা জঙ্গলে পাহাড়ে ইউরেনিয়াম খুঁজে বের করে ইত্যাদি। তবে আইসোটোপ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাকা ফিরলে জেনে নিতে হবে।

বইটা পড়ে আরো জানা গেল ইউরেনিয়ামের পয়লা নমবর খনিজের মধ্যে রয়েছে পিচব্লেন্ড আর ইউরেনিনাইট। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম অকসাইডের ভাগ শতকরা প্রায় ৬৫ থেকে ৯০ অংশ। পিচব্লেন্ড দেখতে সবুজ বা ভেলভেটের মতো কালো হতে পারে। জলের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ ভারী। কিন্তু ইউরেনিনাইট আর একটু বেশি ভারী। জলের চেয়ে প্রায় ৯/১০ গুণ। জল-হাওয়ার সংস্পর্শে অথবা নানা কারণে পরিবর্তন বা রূপান্তরের ফলে নানা ধরনের ইউরেনিয়াম খনিজের জন্ম হয়। এছাড়া মোনাজাইটের মধ্যেও অল্পস্বল্প ইউরেনিয়াম থাকে।

সেদিন বইটা পড়তে পড়তে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এমন সময় কাকা ফিরে এলো। আচমকা পিঠে থাপ্পড় কষিয়ে বলল, 'এসব বই বেশি পড়িস না বাদল। বেশি জ্ঞান বেড়ে গেলে আবার তোকেই লোপাট করে নেবে বোম্বেটের দল।'

'না, ইয়ারকি নয় কাকা। ইউরেনিয়াম থেকে কী করে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করে বুঝিয়ে দাও না!'

'কী করে হাইড্রোজেন বোমা বানায় তা জানলে আমিই তো তৈরি করে ফেলতাম।' বলে হো হো করে হাসতে লাগল কাকা। কাকার হাসিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে রইলাম। আমার অবস্থা দেখে বোধহয় করুণা হলো কাকার।

'ঠিক আছে। পরে একদিন তোকে সব বুঝিয়ে দেব। এখন শোন, পরশুদিন আমি একটু পুরুলিয়া যাচ্ছি দিন কয়েকের জন্য। তুই কি যাবি?'

galpochhabi.blogspot.in

করুণ স্বরে বললাম, 'বারে, আমি বুঝি এখানে বসে আকাশের তারা গুনব?'

'ঠিক আছে, চল। সত্যিই তো, তুই বা এখানে বসে কী করবি? কিন্তু সামনের রোববার তো তোদের মাসির বাড়ি নেমন্তন্ন, তাই না?'

মাথা চুলকে বলি আমি, 'আরে, একেবারে ভুলে গেছি। ঠিক আছে, মাসির বাড়ি নেমন্তন্ন পরে না হয় একদিন খাওয়া যাবে। কিন্তু এই সুযোগ একবার হারালে পরে তো পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক আছে, চল আজ একবার অনুরাধাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

আমাদের বাড়ি পণ্ডিতিয়া রোডে। সেখান থেকে অনুরাধা কাকীমাদের বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। এইট-বি বাসে চেপে মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যেই সেলিমপুরে পৌঁছে গেলাম। এখানেই অনুরাধা কাকীমাদের ছোট একতলা বাড়ি।

সূর্যকাকার বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। সেখান থেকে ওঁর বাবা চলে এসে প্রথমে ওঠেন ঢাকুরিয়ায়। তারপর বছর দুয়েক আগে এই ছোট বাড়িটা তৈরি করেন সূর্যকাকা।

বাড়িতে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন এক ভদ্রমহিলা। কাকাকে দেখে বললেন, 'আসুন সৃজনদা, আসুন।' বুঝলাম ইনিই সূর্যকাকার স্ত্রী অনুরাধা কাকীমা। কাকা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই বুঝি আপনার সেই ভাইপো বাদল। এসো বাবা বাদল, এসো, আমার ঘরে এসো।'

ওঁর পেছন পেছন আমরা ঘরে গিয়ে বসলাম। ঘরটা সাইজে বেশ বড়। প্রায় বারো বাই ষোলো ফিট হবে। কাকা জিজ্ঞেস করে, 'বুবুন কোথায়?'

'পাশের ঘরে ঠাকুমার কাছে ঘুমোচ্ছে।'

ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ঘরের দেওয়ালে সূর্যকাকা আর কাকীমার সঙ্গে বুবুনের একটা ছবি। এপাশে বসবার জন্য দু'তিনটে চেয়ার, ওপাশে খাট। খাটের ওপর বুবুনের জন্য অনেক খেলনা।

'বুবুনের এই খেলনাগুলি ওর বাবাই কিনে দিয়েছিল।' বলতে বলতে কাকীমার মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো। হয়তো সেই বিষণ্ণতা ঢাকবার জন্যই বললেন কাকীমা, 'বসুন সৃজনদা, আপনাদের জন্য চা করে নিয়ে আসি।'

'আরে না না, বোসো, আমরা চা-টা খেয়েই এসেছি। আমরা এসেছি সূর্যপ্রতিমের ব্যাপারে। তোমাকে তো আগের দিনই বলে রেখেছিলাম।'

'আপনার জন্য সেসব আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছি। একটু বসুন আপনারা।'

অনুরাধা কাকীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর আমরা ঘরের চারপাশে আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখছিলাম। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা ছবির অ্যালবাম পড়ে ছিল।

ছবির অ্যালবামটা টেনে নিয়ে আমরা দুজনে দেখতে শুরু করলাম। অ্যালবামে

galpochhobi.blogspot.in

নানা ধরনের পাঁচমিশেলি ছবি। এর মধ্যে বুবুনের ছবিই বেশি। বুবুনের বিভিন্ন ভংগীতে তোলা ছবি। সূর্যকাকার কলেজ জীবনের কয়েকটা ছবিও ছিল। একটা ছবিতে কাকার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সূর্যকাকা। দুজনেরই মাথায় টুপি, হাতে হাতুড়ি, কোমরে কমপাস। কিম্ভূতকিমাকার পোশাক।

ঘরে ঢুকলেন অনুরাধা কাকীমা। হাতে একটা ট্রেতে দু'কাপ চা, দুটো ওমলেট আর বিস্কুট।

'আবার এত সব করতে গেলে কেন?' মৃদু প্রতিবাদ জানায় কাকা। চা খেতে খেতে সূর্যকাকার সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হলো।

অনুরাধা কাকীমা বললেন, 'ইদানীং দু'তিন মাস যাবৎ ওকে খুব চিন্তিত মনে হতো। ভালো করে খেত না, ঘুমতে পারত না। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি, কী ব্যাপার, কী হয়েছে তোমার? কিন্তু কখনোই কিছু খুলে বলে নি। বললে হয়তো আজ এই অবস্থা হতো না।'

অনুরাধা কাকীমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কাকাও খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে একটা চুরুট ধরাল। কাকার ভংগী বেশ চিন্তিত।

'আচ্ছা, সূর্যর এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কবে প্রথম চোখে পড়ে?'

কাকীমা একটু চিন্তা করে জবাব দিলেন, 'গত অক্টোবরে তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে যখন আমেরিকা থেকে ফিরল, তার কিছুদিন পর থেকেই যেন এই ভাবটা লক্ষ্য করি। কিন্তু তখন কিছু বলি নি। ভেবেছিলাম, মানুষের তো কত কারণেই চিন্তা হতে পারে। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম, যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে এটা। তখন ওকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি, কী ব্যাপার তোমার বল? কোন সমস্যা থাকলে সবাই মিলে কিছু একটা নিশ্চয়ই করা যাবে। কিন্তু আগেই বলেছি, এ ব্যাপারে কখনোই মুখ খুলত না।'

কাকা বলল, 'খবরের কাগজে খবরটা পড়ে প্রথমে ভেবেছিলাম, এমনও হতে পারে, হয়তো নিজেই কোন কাজে কোথাও গেছে, কিছুদিন পরেই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তোমার কাছে চিঠি লিখেছে, অফিসের কাজে ও কলকাতায় আসছে। তাছাড়া ওর অফিসে গিয়েও জানতে পেরেছি, ওদের ডিরেকটর কতগুলি বিষয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এটা সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, সূর্যপ্রতিম খেয়ালের বশে হঠাৎ কোথাও চলে যায় নি। কারণ সেরকম গেলে, ওর ক্যাম্পের ড্রাইভার যে ওকে পুরুলিয়ায় বাস-স্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল, সে অন্তত জানতে পারত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ওকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে।'

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'তুমি কি তাহলে বলছ, সূর্যকাকাকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে?'

'নারে, ছেলেধরা ধরবে কেন? ছেলেধরাদের কাজ তো বাচ্চা ছেলেদের ধরা। সূর্য তো আর বাচ্চা নয়। তবে ওকেও ধরে নিয়ে গেছে প্রায় একই কায়দায়। যাকগে,

galpochhabi.blogspot.in

এখন আর জল্পনা-কল্পনা করে বিশেষ লাভ নেই। যেভাবেই ধরে নিয়ে যাক, আমাদের কাজ ওকে উদ্ধার করে আনা। বেচারা সূর্য কোন অন্ধকার ঘুপচিতে বন্দী হয়ে আছে কে জানে!'

অনুরাধা কাকীমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও'র চোখ ছলছল করছে।

কাকা বলল, 'আজ তবে চলি অনুরাধা। পরে আবার আসব।'

ফেরবার সময় অনুরাধা কাকীমার দেওয়া একটা প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এই প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে সূর্যকাকার সাম্প্রতিক কিছু চিঠি, ফাইলপত্র ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিস।

সেদিন গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় বাসে ওঠবার মুখে কোন একটা লোকের ধাক্কায় কাকার হাত থেকে প্যাকেটটা খসে পড়ে গেল রাস্তায়। কাকা সতর্ক ছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল রাস্তায়। আর একটু হলেই খোয়া যাচ্ছিল প্যাকেটটা। আমি পরের বাস-স্টপে নেমে হেঁটে ফিরে এলাম কাকার কাছে।

কাকা বলল, 'দরকার নেই আর বাসে। চল ট্যাকসি করেই ফিরি।'

ট্যাকসি করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, বাসে ওঠামাত্র কাকার হাত থেকে প্যাকেট পড়ে যাওয়া কি আকস্মিক ঘটনা, নাকি কোন লোকের ইচ্ছাকৃত!

॥ দুই ॥

দিন দুয়েক পরেই আমি আর কাকা পুরুলিয়া রওনা হলাম। রাত্রিবেলা চক্রধরপুর-পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারে চেপে পরের দিন ভোরেই পৌঁছলাম পুরুলিয়া। পুরুলিয়া সারকিট হাউসে আমাদের জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করা ছিল, তাই থাকা-খাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। তাছাড়া সারকিট হাউসের বন্দোবস্ত খুব ভালো। বড় ঘর, চৌকিদার স্টেফানিয়ন খুব ভালো রান্না করে। প্রথম দিন দুপুরে ওর তৈরি ভাত আর মুরগির ঝোল খেয়ে মনে হলো অমৃত খাচ্ছি। স্টেফানিয়নের সব ভালো, কেবল একটা দোষ। রাত আটটার পরে ওকে শত ডেকেও পাওয়া যায় না। তখন ও মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু পরের দিন সকালবেলা ও একেবারে অন্য মানুষ। তখন ওর মতো ভদ্র বিনয়ী ভালো মানুষ আর কেউ নয়।

সেদিন দুপুরের পর খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে গেল কাকা। সঙ্গে আমারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কাকা যাচ্ছে একটা দরকারী কাজে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে আমার না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া পরের দিন সূর্যকাকার পুরনো ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য একটা জীপের বন্দোবস্ত করতে হবে। জীপ অবশ্য পাওয়া যাবেই, সঙ্গে যখন কলকাতার পুলিস কমিশনারের চিঠি আছে।

galporchhobi.blogspot.in

কাকা বেরিয়ে যাওয়ার পরে সার্কিট হাউসের কম্পাউন্ডের ভেতরে ঘুরছিলাম, এমন সময় কম্পাউন্ডের গেট দিয়ে একটা লোক ঢুকল ভেতরে। লোকটা মাঝারি লম্বা, কালো, মুখে বসন্তের ছোপ, তবে চাউনি বোকা বোকা। কাঁধে একটা ঝোলা।

আমি ভেবেছি, লোকটা বোধহয় স্টেফানিয়নের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু লোকটা চৌকিদারের ঘরের দিকে না গিয়ে আমার দিকেই গুটিগুটি এগিয়ে এলো। আমি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি, লোকটা ফট করে পকেট থেকে গন্ধমাখা রুমাল-টুমাল বের করে নাকেমুখে চেপে না ধরে। কিন্তু না, সেরকম কিছুই করল না লোকটা।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাবুরা কোত্থেকে আইছেন বটে?'

সংক্ষেপে জবাব দিলাম, 'কলকাতা।'

লোকটা আমার সংক্ষিপ্ত গম্ভীর জবাব বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, আমাকে আর না ঘাঁটিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল।

বিকেলের দিকে ফিরল কাকা। ঘরে ঢুকেই কেমন সন্দেহের চোখে তাকাল। আজকাল কাকার এই এক অভ্যেস। বাইরে থেকে ফিরলে প্রথমেই ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা।

'এই বাদল, এখানে কেউ এসেছিল?'

'কই, না তো।'

'কিন্তু—' কাকার গলার স্বরে অবিশ্বাস।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল, ঝোলা কাঁধে মুখে বসন্তের দাগওলা লোকটির কথা।

'ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। দুপুরের দিকে আমি যখন বাংলোর বাগানে ঘুরছিলাম, তখন একটা লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমরা কোথা থেকে এসেছি। তারপর লোকটা গুটিগুটি আমাদের ঘরে ঢুকে এই খামটা রেখে গেছে।'

টেবিলের ওপর থেকে একটা খাম তুলে খুব সাবধানে মুখটা ছিঁড়ল কাকা। খামের ভেতরে এক টুকরো সাদা কাগজ। তাতে টাইপ করা কয়েকটা ইংরেজি শব্দ —'গো ব্যাক। ইউ আর প্লেয়িং উইথ ফায়ার।' আর চিঠির নিচে একটা নম্বর, ০১৬৮৫১৩২ ছাপানো।

কী আশ্চর্য। লোকটার এত সাহস। আমি বাগানে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঘরে ঢুকে খামটা রেখে গেছে!'

'কিন্তু কাকা, এই একটু আগেও তো এখানেই ছিল লোকটা। রাস্তায় বেরিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করলে হয়তো লোকটাকে এখনো পাওয়া যেতে পারে।'

'না, না। সে কি আর সার্কিট হাউসের ত্রিসীমানায় আছে? তাছাড়া লোকটাকে ধরেও হয়তো বিশেষ লাভ হবে না। মনে হয় দু'চার টাকার বিনিময়ে লোকটাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।'

galporchhabi.blogspot.in

কাকাকে একটু চিন্তিত মনে হয়, 'এবার থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। এখন থেকেই আমাদের পেছনে ফেউ লেগে গেছে রে।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা আর বেরোই না। ঠিক হলো, পরের দিন ভোরে সূর্যকাকার ক্যাম্পের দিকে যাব। ক্যাম্পের দূরত্ব এখান থেকে বেশি নয়, কুড়ি-বাইশ মাইলের মধ্যেই হবে। ঝালদার রাস্তায় বেগুনকুদার নামে একটা বড় গ্রাম আছে। তারই কাছে জায়গাটার নাম তেজকুরি। জায়গাটার নাম সত্যিই অদ্ভুত। এরকম নাম এই আমি প্রথম শুনলাম।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কারণ কাল খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেখলাম, কাকা একগাদা কীসব কাগজ ফাইলপত্র মন দিয়ে পড়ছে। কত রাত পর্যন্ত যে ওসব পড়েছে, তা আমার আর খেয়াল নেই, কারণ তার আগেই আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছি।

কিন্তু মাঝরাতেই কী একটা খুট খুট আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো, কে যেন আমাদের ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় লোকটা আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। লোকটার মুখে বসন্তের দাগ, হাতে বিরাট একটা ছোরা। ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, 'কাকা—'

সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল কাকা।

ঘরের লাইট জ্বালিয়ে এক লাফে আমার বিছানার কাছে। 'কীরে বাদল, কী হয়েছে, চিৎকার করছিস কেন?'

'সেই যে সেই লোকটা, মুখে বসন্তের দাগ, হাতে একটা বিরাট ছোরা নিয়ে এসেছিল।'

'দূর, কোথায় কে, ঘরের দরজা বন্ধ, কে আসবে? তুই বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলি।'

স্বপ্ন দেখছিলাম? স্বপ্ন কখনো এত স্পষ্ট হয়? কে জানে? তাছাড়া সত্যিই তো, ঘরের দরজা বন্ধ, এর মধ্যে কেউ ঢুকবে কী করে! তবে নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠার জন্য খুবই লজ্জা হলো।

পরদিন ভোরে কাকার ডাকে ঘুম থেকে উঠলাম। স্টেফানিয়ন চা-জলখাবার দিয়ে গেল। ডি-সি'র অফিসে গিয়ে কাকা বন্দোবস্ত করে এসেছিল। তাই জীপও ঠিক সময়মতো হাজির। সাতটা নাগাদ রওনা হয়ে আটটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম তেজকুরি গ্রামে। ওখানে ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীর ক্যাম্প খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধেই হয়নি। সূর্যকাকার ক্যাম্প চেনে না, এমন লোক ধারে কাছে কেউ নেই। বিশেষত ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীর নিরুদ্দেশ হবার পর যেন তেজকুরি গ্রামের মাহাত্ম্য বেড়ে গেছে। পথে আমরা যাকেই জিজ্ঞেস করেছি, সে-ই বেশ ফলাও করে ডঃ চ্যাটার্জীর নিরুদ্দেশ হবার কাহিনী বলে গেছে।

galpochhabi.blogspot.in

জঙ্গলের মধ্যে ভূতাত্ত্বিকদের তাঁবু যেমন হয়, তার চেয়ে সূর্যকাকার ক্যাম্প এলাকার সীমানা অনেক বড়, জাঁকজমকও অনেক বেশি। বাইরে থেকে দেখে একটু ভক্তিশ্রদ্ধাও হয়। কাঁটাতারের বাইরে জনকয়েক পাহারাদার পুলিস। আমাদের জীপ পৌঁছনো মাত্র ওরা আমাদের পথ আটকালো।

কাকা আইডেনটিটি কার্ড দেখালে আমাদের পথ ছেড়ে দিল পুলিস। ক্যাম্প এলাকার পুরোটাই কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বড় গেট। ভেতরটা দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। সূর্যকাকার ক্যাম্প অফিসের বাড়িটা পুরোপুরি অ্যালুমিনিয়াম আর কাচ দিয়ে তৈরি। অফিসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে।

ভদ্রলোকের গলার স্বরে ইতস্তত ভাব, 'আপনারা—'

কাকা নিজের পরিচয় দিল, 'আমি সৃজন বোস। আপনাদের ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীর সহপাঠী ও বন্ধু। এ আমার ভাইপো বাদল। আমার সঙ্গে একটু ঘুরতে এসেছে।'

'কিন্তু ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জী তো এখন নেই। উনি—'

'সব খবর নিয়েই এসেছি। বলতে গেলে সেজন্যই এসেছি। যাক গে, আপনার পরিচয় তো জানতে পারলাম না।'

'আমার নাম হীরেন ভৌমিক। আমি ডঃ চ্যাটার্জীর সহকারী। ওঁকে ল্যাবরেটরির কাজে সাহায্য করতাম।'

'এখানে ল্যাবরেটরিও আছে নাকি?'

হীরেন ভৌমিকের চোখেমুখে গর্বের ভাব ফুটে উঠল, 'আছে বৈকি। কিছুদিন ধরে আমরা তো এখানেই নানা ধরনের গবেষণা চালাচ্ছিলাম। আর কিছুদিন কাজ করলেই হয়তো সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কার করে ফেলতাম। কিন্তু ডঃ চ্যাটার্জী তার আগেই যে কোথায় চলে গেলেন!'

'আচ্ছা মিঃ ভৌমিক, আপনার কি মনে হয়, ডঃ চ্যাটার্জী নিজে থেকেই কোথাও চলে গেছেন?'

সৃজনকাকার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু যেন থতমত খেলেন মিঃ ভৌমিক, 'না, দেখুন, এ ব্যাপারে ঠিকঠাক কিছু বলা মুশকিল। কারণ কী যে হয়েছে তা বলব কী করে?'

'তা' ঠিক। আচ্ছা, আপনার অফিসে একটু বসলে আপত্তি আছে?'

'না না, এতে আর আপত্তি কিসের?'

আমরা তিনজনে মিলে সূর্যকাকার অফিসে ঢুকলাম। এখন সূর্যকাকা না থাকলেও এটাকে সূর্যকাকার অফিসই বলছি। কারণ এখানে বসেই নিজের গবেষণা সংক্রান্ত কাজকর্ম করতেন ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জী। অফিসের ভেতরটা দেখলে সত্যিই মনে হয় যেন এক বড় বিজ্ঞানীর ঘরে ঢুকেছি। ঘরের মাঝামাঝি বিরাট

galpochhabi.blogspot.in

সাইজের স্টিল টেবিল, ওপাশে একটা চেয়ার। এদিকে অতিথিদের জন্যও তিন চারটে চেয়ার। বড় টেবিলের পাশে ছোট সাইজের একটা টেবিল, তার ওপরে একটা মাইক্রোস্কোপ, আর একপাশে আরো কয়েকটা যন্ত্রপাতি। ঐ যন্ত্রপাতিগুলির নাম আমি জানি না, পরে কাকাকে জিজ্ঞেস করে নাম জেনে নিতে হবে। বড় টেবিলের ওপরে বেশ কিছু বই আর পাথরের নমুনা।

কাকা ঐ পাথরগুলির একটা হাতে নিয়ে বলল, 'এটা পিচব্লেনড মনে হচ্ছে।'

'ঠিকই ধরেছেন। খুব ভাল কোয়ালিটির পিচব্লেনড। ডঃ চ্যাটার্জীই এখানকার জঙ্গলে আবিষ্কার করেছেন।'

'ঠিক আছে। আপনাদের ল্যাবরেটরিটা যদি একটু দেখাতেন—'

'মাফ করবেন। ওটা দেখাবার ব্যাপারে মানা আছে। ডাঃ চ্যাটার্জীই নিয়ম করে গিয়েছেন। তবে আপনি যদি আমাদের কলকাতা অফিস থেকে অনুমতি আনেন, তবে দেখাতে কোন আপত্তি নেই। আপনার দেখতে চাওয়ার কারণটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার অসুবিধাটাও আশা করি বুঝতে পারছেন।'

কাকা অল্প হাসল, একটা চুরুট ধরাল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তাতে আপনার বিব্রত হবার কিছু নেই। আসলে আমারই ভুল হয়ে গেছে। আমিই তাড়াহুড়ো করে আপনাদের কলকাতা অফিস থেকে ঠিকঠাক মতো অনুমতি-পত্র নিয়ে আসিনি। তবে পরের বার যখন আসব, তখন আর ভুল হবে না।'

এরপর আমরা সবাই অনেকক্ষণ নীরবে চুপচাপ বসে রইলাম। কাকা একমনে চুরুট খেয়ে যাচ্ছে আর মিঃ ভৌমিক কী সব কাগজপত্র যেন পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

আমি বললাম, 'চল না কাকা, ক্যাম্পের ভেতরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখি।'

কাকা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তাই ভালো। চলুন না মিঃ ভৌমিক। ক্যাম্পের ভেতরটা একটু যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান আমাদের।'

'চলুন,' ভৌমিক উঠে দাঁড়ালেন।

কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জায়গাটা বেশ বড়সড়। প্রায় চার-পাঁচ একরের মতো হবে। একটা গোল বলের মতো বাড়ি দেখিয়ে হীরেনবাবু বললেন, 'এটাই আমাদের ল্যাবরেটরি। আপাতত চাবি বন্ধ আছে। আশা করি পরের বার আপনাকে দেখাতে পারব।'

এছাড়া আমরা আরো দেখলাম, তিন চারজন স্টাফের জন্য থাকবার বাড়ি, ড্রাইভারের থাকবার ডেরা। একটা গেস্ট হাউস। স্যাম্পেল হাউস, যেখানে জঙ্গল থেকে পাথরের স্যাম্পেল এনে রাখা হয়। এছাড়া দেখলাম কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি। এখানে পাথরের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা হয়। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির মধ্যে এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম।

মিঃ ভৌমিক বললেন, 'উনি ডঃ শ্রীনিবাসন। পাথরের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করছেন। যাবেন নাকি ভেতরে?'

galporchhabi.blogspot.in

কাকা বলল, 'না, আজ থাক, পরে আর একদিন পরিচয় হবে। বরং আজ যদি আপনার সময় থাকে, জঙ্গলের ভেতরে কোথায় আপনারা পিচব্লেনড পেলেন, সেটা একটু দেখে আসব।'

মিঃ ভৌমিকের মুখ দেখে মনে হলো, কাকার এই প্রস্তাব ওঁর মনোমত হয়নি, তবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মিঃ ভৌমিক।

'আপনার জীপ নিয়েই চলুন। তবে সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতি নিতে হবে।'

॥ তিন ॥

জঙ্গলের দিকে রওনা হবার আগে একটি যন্ত্র তোলা হলো জীপে। কাকার মুখে শুনলাম যন্ত্রটার নাম গাইগার কাউন্টার। পাথরের মধ্যে ইউরেনিয়াম বা অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে গাইগার কাউন্টার যন্ত্রে তা ধরা পড়বে। ইউরেনিয়াম থোরিয়াম ইত্যাদি ধাতু থেকে এক ধরনের রশ্মি বেরিয়ে আসে। এই রশ্মিই ধরা পড়ে গাইগার কাউন্টার যন্ত্রে। সুতরাং কোন পাথরের ওপর এই যন্ত্র বসিয়ে বুঝতে পারা যায়, সেই পাথরের মধ্যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে কিনা।

কাঁটাতারের গেট পেরিয়ে আমাদের জীপ ছুটল জঙ্গলের দিকে। আমাদের সামনে দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট অযোধ্যা পাহাড়। ধূসর সবুজ রংয়ের পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল। সেই ঘন জঙ্গল পাহাড় ছেড়ে নিচের সমতলেও নেমে গেছে। জঙ্গলের কাছাকাছি পেঁৗছে আমাদের জীপ থেমে গেল। জীপ চলার মতো রাস্তা নেই আর। আমরা সবাই জীপ থেকে নামলাম। জীপ থেকে নামানো হলো গাইগার কাউন্টার যন্ত্রটাও। ক্যাম্প থেকে আসবার সময় হীরেনবাবু দুজন কুলিকে এনেছিলেন। ওরাই জঙ্গলের মধ্যে যন্ত্রটাকে বয়ে নিয়ে চলল। এবার জঙ্গলের মধ্যে আমাদের পর্যটন শুরু হবে অচিন পাথরের সন্ধানে। যে পাথর ছেঁচে ইউরেনিয়াম বের করে তৈরি হয় হাইড্রোজেন বোমা, অ্যাটম বোমা, সেই পাথর এবার নিজের চোখে দেখতে পাব ভেবে শিহরিত হচ্ছিলাম। সেই পাথরের রং কীরকম হবে—লাল, হলুদ না সবুজ কে জানে? যে যন্ত্র তার অদৃশ্য চোখ দিয়ে দেখে আমাদের বলে দেবে, সেই যন্ত্রটাও না জানি কী অদ্ভুত শক্তিশালী, অনেকটা আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপের মতো। সেই যন্ত্রও আমাদের সঙ্গে চলেছে। যে লোক দুটি এই যন্ত্রটা বয়ে নিয়ে চলেছে তারা কি জানে কী এক আশ্চর্য দৈত্যকে ঘাড়ে নিয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে মনে হলো যেন গায়ে রোম-ওঠা দুর্দান্ত এক রোমাঞ্চকর অভিযানে চলেছি আমরা।

কাকার ঘড়িতে সময় দেখলাম। সকাল প্রায় সাড়ে ন'টা। এরই মধ্যে মার্চের রোদ বেশ কড়া। ঘন জঙ্গলের গাছপালার ভেতর দিয়ে যেটুকু রোদ চুঁইয়ে আসছে তাতেই বেশ গরম লাগছে। জামার ভেতরে অল্প অল্প ঘামছি। কিন্তু তাতে কুছ

galporchhabi.blogspot.in

পরোয়া নেই। ইউরেনিয়ামের সন্ধানে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাবতেই ভালো লাগছে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা ছোট নদী। নদীর বুকে প্রচুর বালি, পাথর, কাঁকর। আর যা জল তাতে গোড়ালিও ডোবে না। কাকা, হীরেনবাবু ও আমার পায়ে গামবুট ছিল, তাই নির্ভয়ে জল পেরিয়ে চলে গেলাম ওপারে। মাল বইবার জন্য যে দুজন ছিল, ওদের পায়ে কোন জুতো নেই, ওরাও খালি পায়ে দিব্যি পেরিয়ে গেল। নদীর এপারে সামান্য একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা। কিন্তু ওপারে পায়ে-হাঁটা রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। জঙ্গল আরো ঘন। শাল, সেগুন, পিয়াল, গামার, বহরা গাছের ঘন জঙ্গল। এখন মার্চের মাঝামাঝি। গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। গাছের তলায় পড়ে আছে রাশি রাশি ঝরা পাতা। আমাদের সকলের পায়ের চাপে শুখনো পাতা মচমচ করে ভেঙে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে পলাশ গাছের জটলা। তাতে সিঁদুরে রংয়ের অজস্র লাল ফুল। দেখলে মনে হয়, জঙ্গলের গাছেরা যেন হোলি খেলা শুরু করেছে।

মুগ্ধ হয়ে পলাশ ফুলের শোভা দেখছি, এমন সময় সামনের লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'সাপ, সাপ—'

আমরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেলাম। সাপ, কোথায় সাপ! মালবাহী লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, ঘন বাদামী রংয়ের একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। মনে হয় কোন কারণে সাপটা খুব ক্ষেপে গেছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। সাপের ঐ মূর্তি দেখে খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের দিকে তেড়ে এলেই হয়েছে আর কি? কিন্তু সঙ্গের লোক দুজন খুব তৎপর। ওরা ঝটপট কোত্থেকে গাছের ডাল জোগাড় করে পিটিয়েই মেরে ফেলল সাপটাকে। মরা সাপটাকে দেখে দেখে মন্তব্য করলেন হীরেনবাবু, 'এটা পাহাড়ী চন্দ্রবোড়া। ওর ছোবল একবার খেলে আর দেখতে হবে না। একেবারে সাক্ষাৎ স্বর্গ!'

আবার আমাদের পথ চলা শুরু হলো। এবার চলতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। পায়ের তলায় নানা রকমের কাঁটা ঝোপ, পাহাড়ী লতা। প্রায়ই পায়ে জড়িয়ে বাধার সৃষ্টি করছে। হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে কাঁটায়।

আরো বেশ খানিকটা যাওয়ার পরে আমরা একটা পাহাড়ী গুহার মুখোমুখি। গুহাটা খুবই অদ্ভুত ধরনের। অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো। সেই সুড়ঙ্গ কোন পাতালে চলে গেছে কে জানে?

হীরেনবাবু বললেন, 'এই যে গুহাটা দেখছেন, এটা এই পাহাড়কে ভেদ করে পাহাড়ের ওপাশে বেরিয়ে গেছে। যাবেন নাকি পাহাড়ের ওপাশে?'

কাকা খুব মন দিয়ে গুহার পাথরগুলি পরীক্ষা করতে শুরু করল। হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে, দেখা গেল পাথরের রং সবুজ কালো, মাঝে মধ্যে হলুদের ছোপ।

কাকা বলল, 'মিঃ ভৌমিক, আপনার গাইগার কাউণ্টারটা একটু নামাতে বলবেন?'

galpochhabi.blogspot.in

মিঃ ভৌমিক হাসলেন, 'ওঃ, আপনি পাথরের রেডিয়ো-অ্যাকটিভিটি পরীক্ষা করে দেখবেন? আরে না, না, এসব পাথরগুলিতে কোন তেজস্ক্রিয়তা নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট। চলুন, গুহার ওপারে চলুন। আপনাকে প্রচুর ইউরেনিয়ামের আকরিক দেখাব।'

কাকা নিজের সিদ্ধান্তে অচল, 'না, মিঃ ভৌমিক। এখানে একটু পরীক্ষা করে দেখলে এমন কী আর ক্ষতি। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

হীরেন ভৌমিককে অগত্যা নিমরাজি হতে হলো। উনি ইশারায় লোক দুটোকে যন্ত্র নামাতে বললেন। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হলো বিশেষ খুশি হননি।

কিন্তু কী আশ্চর্য, যন্ত্রটা পাথরের ওপর ঠিকঠাক সেট করে বসানো মাত্র যন্ত্রের কাঁটা তিড়িক করে লাফিয়ে উঠল।

'এই তো, পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি—' কাকার উৎসাহ আর ধরে না। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে দেখি মিঃ ভৌমিকের মুখ গম্ভীর, রাগী।

সুজনকাকা বাচ্চা ছেলের মতো বলতে শুরু করে, 'দেখুন মিঃ ভৌমিক, পাথরটা ভেঙে তার রং আর চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। দেখলেন তো, আহ, কেমন একটা নতুন আবিষ্কার হয়ে গেল।'

ওদিকে মিঃ ভৌমিক শুনেও শুনছেন না। শুধু গম্ভীর মুখে বললেন, 'এখানে আকরিকের পরিমাণ খুবই কম হবে। মনে হচ্ছে যেন পাতলা স্তরের আকারে রয়েছে এখানে।'

'না মিঃ ভৌমিক, আমার তা মনে হয় না। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত পাহাড়টাই ইউরেনিয়াম আকরিকে তৈরি। ঠিক আছে, চলুন গুহাটার ওপারে আপনাদের আবিষ্কার করা পাথরগুলি এবার দেখি। চলুন।'

'না, আজ থাক। পরে আর একদিন আপনাদের নিয়ে যাব। আজ শরীরটা হঠাৎ বেশ খারাপ লাগছে। চলুন ক্যাম্পে ফেরা যাক।'

'তাই নাকি। তবে তো খুব ঝামেলায় পড়লেন! ঠিক আছে, চলুন ফেরা যাক।' কাকা বলল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার হেঁটে ফেরা শুরু হলো। নদী পেরিয়ে দেখলাম, জীপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

মিঃ ভৌমিককে ওঁর ক্যাম্পে পৌঁছে দিলাম।

সুজনকাকা জিজ্ঞেস করল, 'এখন শরীর কেমন লাগছে মিঃ ভৌমিক?'

'ভালো।' সংক্ষিপ্ত গম্ভীর জবাব মিঃ ভৌমিকের।

আর কোন কথা না বলে মিঃ ভৌমিক হাঁটতে শুরু করলেন নিজের আস্তানার দিকে। জীপে ফেরবার পথে আমরা দুজন আর কোন কথা বলি নি।

সারকিট হাউসের ঘরে ঢুকে কাকা গম্ভীর মুখে বিছানায় বসে পড়ল।

আমি বললাম, 'যাই বল কাকা, মিঃ ভৌমিকের শরীর খারাপ হওয়াটা কেমন যেন বানানো মনে হলো।'

galporchhabi.blogspot.in

এবার কাকার মুখে মুচকি হাসি দেখা গেল, 'কেন?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হলো।'

'ঠিক বলেছিস।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি আর কাকা ডেপুটি কমিশনারের কোয়ার্টার্সে গেলাম। রাঁচি রোডের ওপর সুন্দর দোতলা বাড়ি। আমরা গেটে পোঁছতে রাস্তা আটকালো রাইফেলধারী গার্ড। স্লিপ-প্যাডে নাম পরিচয় লিখে দিল কাকা। একটু পরেই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মিলল।

বাইরের বসবার ঘরটার ভেতরটা বেশ সুন্দর সাজানো-গোছানো। দেওয়ালের গায়ে একটা বাঘের মুণ্ডু ঝোলানো। হাঁ-করা বাঘের মুণ্ডুটা এত জীবন্ত যে প্রথমে ঢুকেই বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে খেয়াল হলো, আরে এ তো জীবন্ত বাঘ নয়, এ হলো দেয়ালের গায়ে ঝোলানো মরা বাঘের মুণ্ডু। বাঘের মুখ ছাড়াও আরো নানা রকম কিউরিয়ো দিয়ে ঘরটা সাজানো। বোঝা যায় ভদ্রলোক খুব শৌখিন।

একটু পরেই ডেপুটি কমিশনার ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের চেহারা রাশভারি। শক্তসবল দেহের গঠন। পরনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি, পাজামা।

সৃজনকাকাকে দেখে অল্প হাসলেন, তারপর বললেন, 'কি খবর বলুন সৃজনবাবু?'

কাকা বলল, 'এ আমার ভাইপো বাদল। একেও সঙ্গে নিয়ে এলাম।'

'খুব ভালো করেছেন।'

পরিচয় হলো। ভদ্রলোকের নাম অসীম দত্ত। দু'বছর হলো এখানে এসেছেন। এর আগে ছিলেন দারজিলিংয়ে। কথায় কথায় পরিচয় বেরলো, অসীম দত্ত কাকার কলেজেরই ছাত্র। তবে বছর তিনেকের সিনিয়ার।

অসীম দত্ত বললেন, 'আরে আপনিও আমার কলেজের ছাত্র। তবে তো আপনার সঙ্গে আমার আলাদা সম্পর্ক।'

কাকা নিজে চুরুট ধরাল। অসীমবাবুকেও দিল একটা। তারপর দুজনে মিলে শুরু হলো কলেজ জীবনের গল্প।

চা-বিস্কুট এলো। গল্প-গুজব হলো কিছুক্ষণ। কাকার সঙ্গে অসীম দত্তর আলোচনা শুরু হলো ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীকে নিয়ে।

'আচ্ছা, মিঃ দত্ত, আপনি তো ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীকে চিনতেন?'

'বারে, চিনব না কেন! উনিও মাঝে মধ্যে আমার কাছে আসতেন। তাছাড়া আমিও দু'একবার ওঁর ক্যাম্পে গিয়েছি। খুবই ভালো কাজ করছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেটাই ওর কাল হলো। বদ চক্রের নজরে পড়লেন।'

'সত্যি, খুবই দুঃখের ব্যাপার। পুলিস থেকে তো ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে। আপনি মিঃ নিগমের সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'এখানকার এস পি তো। না, এখনো করিনি। দু'চার দিনের মধ্যেই দেখা করব।'

galporchhabi.blogspot.in

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন অসীমবাবু, 'বড় ভালো লোক ছিলেন ডঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু উনি যে হঠাৎ এভাবে লোপাট হয়ে যাবেন, তা কখনো চিন্তা করিনি। গভর্নমেন্টও এ ব্যাপারে খুবই ওয়ারিড। দিল্লী থেকে আমার কাছে চিঠি এসেছে। আচ্ছা সৃজনবাবু, আপনি এ ব্যাপারে কি করছেন?'

'বিশেষ কিছুই না। সূর্য আমার ক্লাস-মেট ছিল। তাই এখানে এসে একটু খোঁজ-খবর করছি।'

'কিন্তু আপনি একলা কি কিছু করতে পারবেন? আপনি বরং আমাদের পুলিসের সঙ্গে কাজ করুন। আমি মিঃ নিগমকে বলে দেব।'

'খুবই ভালো প্রস্তাব। পুলিসের সাহায্য ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়। তবে দিন কয়েক আমি একলা এখানকার ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে চাই। তারপর না হয় পুলিসের সঙ্গে কাজ করা যাবে। শুধু একটা ব্যাপার। দিন কয়েকের জন্য যদি আমাকে একটা জীপ দেন—'

কাকার কথায় কিছুক্ষণ গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করলেন অসীম দত্ত, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। কোন প্রবলেম নেই। তবে নতুন কিছু জানতে পারলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।'

'আরে না না, সে কী কথা। কোন হদিস পেলেই আপনাকে জানাব।'

এরপর আমরা উঠলাম। অসীম দত্ত বাংলোর গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

॥ চার ॥

অসীম দত্তের বাংলো থেকে সারকিট হাউস দূরে নয়। বাঁধানো পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় কাকা হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারল আমাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো রঙের অ্যামবাসাডার প্রচণ্ড স্পিডে আমার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। আমি তখন হাঁপাচ্ছি, আর একটু হলেই গাড়ির তলায় চাপা পড়ছিলাম।

'কি আশ্চর্য, কীভাবে যে এরা গাড়ি চালায়!' কাকার গলার স্বরে রাগ, বিস্ময় ও ভয়ের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

একটু পরে সারকিট হাউসে পেঁছে দেখি, পোরটিকোতে একটা কালো অ্যামবাসাডার। গাড়িটা খালি, ভেতরে কোন আরোহী বা ড্রাইভার নেই।

নিচু স্বরে কাকাকে বললাম, 'কাকা, দেখ সেই কালো অ্যামবাসাডার।'

'না না, তা কী করে হবে! কালো অ্যামবাসাডার কি কেবল একটাই আছে?'

সারকিট হাউসে ঢুকে দেখলাম, আমাদের উলটো দিকের ঘরটায় কারা যেন এসেছে। বোধহয় এই কালো অ্যামবাসাডার চেপেই এসেছে। ঘরটা ভেতর থেকে ভেজানো। কারা ফিসফিস করে কথা বলছে ঘরের ভেতর।

আমাদের ঘরে ঢুকে কাকা বসেছে নিজের নোটবুক খুলে। কী সব লিখে যাচ্ছে।

galpopshahabi.blogspot.in

আমিও একটা গল্পের বই খুলে বসেছি। কিন্তু বইয়ে কিছুতেই মন বসছে না। অসীম দত্তর বাড়ি থেকে ফেরবার সময় যে কালো অ্যামবাসাডারের তলায় চাপা পড়তে পড়তে কোন রকমে বেঁচে গেছি, তার কথা ভুলতে পারছি না কিছুতেই। এটা কি নিছকই ড্রাইভারের বেপরোয়া গাড়ি চালানো, নাকি এর সঙ্গে সূর্যকাকার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কোন যোগ আছে! সারকিট হাউসের পোরটিকোয় দাঁড় করানো গাড়িটা কি ঐ কালো অ্যামবাসাডার! আমাদের উলটো দিকের ঘরে দরজা ভেজিয়ে কারা আলোচনা করছে! কী আলোচনা করছে?

কাকার দিকে তাকিয়ে দেখি, কাকা নিশ্চিন্তে কীসব লিখে চলেছে। এসব ব্যাপারে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কাকার ওপর বেশ রাগ হলো। অসীম দত্ত তো বলেই দিয়েছেন, পুলিসের সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে। ফোন করে দিলেই তো পুলিস এসে এই কালো অ্যামবাসাডারের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। তারপর জেরার চোটে সব কবুল করে ফেলবে ড্রাইভার বাবাজী। তারপর সূর্যকাকাকে উদ্ধার করে ড্যাং ড্যাং করে কলকাতায় ফিরে যাব।

কাকা নোট লিখতে লিখতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'কিরে! তুই এখনো সেই কালো অ্যামবাসাডারের কথা ভুলতে পারছিস না?'

'কেন, ভাবলে দোষটা কি?' আমার গলার স্বরে অভিমান।

'না, দোষ কিছু নেই। তবে অনর্থক সময় নষ্ট। কারণ আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। এমন কি ঐ কালো অ্যামবাসাডারের নম্বরও আমরা দেখে রাখতে পারিনি।'

দরজায় দুবার টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখি, স্টেফানিয়ন।

'সাব, আপনাদের খাবার দিয়ে দেব?'

কাকা ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, দাও, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে।'

স্টেফানিয়ন চলে গেল। কাকা আবার নোটবইতে কীসব লিখতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেক পরে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখি, দুজন ভদ্রলোক খাচ্ছেন। একজনের চেহারা খুব ভালো। ফরসা, মাঝারি গড়ন, চল্লিশের কাছে বয়স। পরনে দুধের মতো সাদা শার্ট আর কালো স্ট্রাইপড ট্রাউজার। আর একজনের বয়েস বেশ কম, পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। লম্বা, গায়ের রং বাদামী, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে হাফ হাতা স্পোর্টস গেঞ্জি, টাইট ট্রাউজার, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। দ্বিতীয় লোকটির চেহারায় নিষ্ঠুরতার ছাপ।

আমি আর কাকা টেবিলের অন্য প্রান্তে বসলাম। স্টেফানিয়ন তখনো আমাদের খাবার দেয়নি। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের দিকে চোখ পড়ে যাচ্ছিল আমাদের। আমরা আসবার আগে নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ওরা, কিন্তু আমাদের জন্যই বোধহয় নীরবে খাবার খেয়ে যাচ্ছে। আমরা চারজনে একই টেবিলে বসে, অথচ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছি না, এই ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর।

galpersharbi.blogspot.in

অস্বস্তি এড়াতে কাকা জিজ্ঞেস করল ইংরেজিতে, 'আজই বোধহয় আপনারা এসেছেন?'

ফরসা মাঝারি চেহারার ভদ্রলোক চমৎকার ইংরেজি উচ্চারণে জবাব দিলেন, 'ও, হ্যাঁ। আপনারা?'

'আমরা দিন কয়েক হলো এসেছি।'

'ব্যবসার কাজে?'

'না। বলতে পারেন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণার কাজ।'

'ও, দ্যাটস রাইট। কী ধরনের কাজ করছেন জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। তবে সে রকম কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। আমি জিয়োলজিস্ট। একটু ঘুরে-ফিরে দেখছি কী ধরনের খনিজ এখানে পাওয়া যেতে পারে। আপনারা?'

'আমি বিজনেস করি। সার্ভে করে দেখছি কী ধরনের বিজনেস করা যায় এখানে।'

'আপনার নাম?'

'মিঃ ডেভিস, এ আমার অ্যাসিসট্যাণ্ট আজিজুর রহমান। আপনার নাম জানতে পারি কি?'

'আমি সৃজন বোস। আমার ভাইপো বাদল।'

আমরা সবাই হাত তুলে নমস্কার জানালাম। আমি লক্ষ্য করছিলাম আমাদের আলোচনার সময় আজিজুর রহমান একটাও কথা বলেনি বা আলোচনায় অংশ নেবার মতো উৎসাহ দেখায়নি। কেবল পরিচয় করিয়ে দেবার সময় দায়সারা গোছের নমস্কার করেছিল।

একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এলো স্টেফানিয়ন। মিঃ ডেভিসের দিকে ফিরে বলল, 'সাব, আপকা ট্রাংকল।'

মিঃ ডেভিসও তক্ষুণি ছুটলেন টেলিফোন ধরতে। আজিজুরও গেল পেছন পেছন।

আমরা দুজনে কী আর করব, চুপচাপ বসে রইলাম। একটু পরে স্টেফানিয়ন আমাদের খাবারও সাজিয়ে দিল।

খানিকক্ষণ পরে ডেভিস ও আজিজুর ফিরে এলো।

'উই আর সরি। আমাদের এক্ষুণি যেতে হবে।'

ডাইনিং টেবিলে খাবার-দাবার ঐ অবস্থাতেই পড়ে রইল। তিন মিনিটের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। স্টেফানিয়নের হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে চেপে বসল গাড়িতে। প্রচণ্ড স্পিডে গাড়ি বেরিয়ে গেল সারকিট হাউসের কমপাউন্ড থেকে। সমস্ত ব্যাপারটা মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এমনভাবে ঘটল, যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জেনারেল শমন পাঠিয়েছে।

আমরা সবে খেতে শুরু করব, এমন সময় কাকা বলল, 'চল তো বাদল, কলকাতায় একটা টেলিফোন করি।'

আমি আর কাকা টেলিফোনের কাছে সবে মাত্র পেঁছেছি, এমন সময় প্রচণ্ড

galpopchhabi.blogspot.in

বিস্ফোরণের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম আমরা। এসে দেখি লন্ডভন্ড অবস্থা। ডাইনিং টেবিল, তার ওপরে প্লেট ডিশ সব ভেঙে টুকরো টুকরো, চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। ঘরের এক কোণে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে স্টেফানিয়ন। কাছে গিয়ে কাকা হাত রাখল ওর নাকে। না, মরে যায়নি, প্রাণ আছে। তবে একটা হাত বিচ্ছিরিভাবে পুড়ে গেছে।

'যা তো বাদল, শিগগির পুলিসে আর হাসপাতালে ফোন করে দে। আচ্ছা, তুই বরং এখানে দাঁড়া। আমিই ফোন করছি।'

কাকা ফোন করতে চলে গেল। ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের শব্দে কমপাউন্ডের আরো দু'চারজন লোক হাজির। এরা সবাই সারকিট হাউসে নানা ধরনের কাজ করে। কেউ ঝাড়ুদার। কেউ দারোয়ান।

ওরা স্টেফানিয়নকে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে হতবাক। সবাই নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে। সে সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, 'স্টেফানিয়নের আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?'

'না তো। ওর বউ ছেলেমেয়ে গোয়ায় থাকে। এখানে ও একলাই থাকত।' টেলিফোনের জায়গা থেকে কাকা ফিরে এলো একটু পরেই।

'পুলিস আর হাসপাতালে ফোন করে দিয়েছি। এই এলো বলে। কলকাতার বাড়িতেও ফোন করে আমাদের খবর জানিয়েছি। ভেবেছিলাম কাল ফিরে যাব কলকাতায়, তা' আর হবে না—' কাকা এবার স্টেফানিয়ানকে ভালো করে পরীক্ষা করল। আমরা দেখলাম, স্টেফানিয়নের অবস্থা বেশ গুরুতর। শুধু হাত নয়, গালের একটা অংশও পুড়ে গেছে। এখানে পুরুলিয়া হাসপাতালে ঠিকঠাক মতো চিকিৎসা হবে কিনা কে জানে?

একটু পরেই পুলিস ও অ্যামবুলেন্স এলো। পুরুলিয়া থানা থেকে এসেছেন একজন সাব-ইন্সপেকটর ও ডি. এস. পি.। ডি. এস. পি. ভদ্রলোক কাকার দিকে এগিয়ে এলেন, 'আমি শিরীষ পাল, ডি. এস. পি.। আপনি?'

কাকা নিজের পরিচয় দিল।

শিরীষ পাল জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন তো সৃজনবাবু, কী করে ব্যাপারটা ঘটল? সারকিট হাউসের ভেতরে বোমা বিস্ফোরণ। আমি তো কোনদিন শুনিনি।'

কাকা সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা বলল, এমন কি সূর্যকাকার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনাও।

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, সূর্য চ্যাটার্জীর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে আমিই তো ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছি। কিন্তু তা যে এত সাংঘাতিক ব্যাপার, তা তো কল্পনাই করতে পারিনি। আমি তো ভেবেছিলাম, ভদ্রলোক কোন কারণে হয়তো গা ঢাকা দিয়ে আছেন, কিছুদিন পরেই ফিরে আসবেন। কিন্তু ব্যাপার দেখছি আরো ঘোরালো। যাক, আপনাকে অন্তত আমাদের সঙ্গে পাওয়া যাবে। এটাই যা লাভ।'

galporchhabi.blogspot.in

এদিকে অ্যামবুলেন্সের লোকজন স্টেফানিয়নকে স্ট্রেচারে করে গাড়িতে চাপাল।

শিরীষ পাল ওদের বললেন, 'আপনারা যান। আমার লোক একটু পরে যাচ্ছে।'

এবার শিরীষ পাল কাকার দিকে তাকালেন, 'মিঃ বোস, আপনার সঙ্গে আমার একটু আলোচনা আছে। আপনি যদি কাল সকাল দশটা নাগাদ আমার অফিসে আসেন তো খুব ভালো হয়। আসবেন?'

কাকা হাসল, 'না না, এতে আর আপত্তি করবার কি আছে। বিশেষত আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যই যখন এক। ঠিক আছে, আমি যাব।'

শিরীষ পাল চলে যাচ্ছিলেন, কী মনে হওয়ায় আবার ফিরে এলেন, 'ওহো, আজ রাতে তো আপনাদের খাওয়াই হলো না।'

'এক রাত না খেলে কী আর হবে। এসব অভ্যেস আছে।'

'আপনার হয়তো আছে। কিন্তু আপনার ভাইপো বাদলের তো কষ্ট হবে।'

'ঠিক আছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। একটু পরে আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। যে কনস্টেবল আপনাদের জন্য খাবার নিয়ে আসবে, সে বাকি রাতটা এখানেই পাহারা দেবে। তাছাড়া আমি কলকাতায় খবর পাঠাচ্ছি। দেখি কাল নাগাদ যদি ফরেনসিক এক্সপার্ট আসেন।'

শিরীষ পাল জীপে চড়ে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে একজন কনস্টেবল টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে এলো। ভাত, ডাল, মাছ। শিরীষ পাল নিজের বাড়ি থেকে খাবার পাঠিয়েছেন।

বোমার বিস্ফোরণ, ভাগ্যক্রমে আমাদের বেঁচে যাওয়া, বেচারা স্টেফানিয়নের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—সব মিলিয়ে আমি খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। কাকার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। তবু আমরা কোনরকমে খেয়ে নিলাম।

বাকি রাতটা বিস্ফোরণের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই কাটাতে হবে। সেদিন রাতে আলো নেভানো হলো না। চোখ বুজে কোনরকমে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

কাকাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করবার ছিল। মনে হলো, কাকারও অনেক কিছু বলার আছে আমাকে। তবু ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা দুজনেই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। কাকা যদি তখন ফোন করতে না যেত, তবে আমাদের অবস্থা যে কী হতো, তা ভাবতেই শিউরে উঠছিলাম বারবার।

উলটো-পালটা নানা ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা আর খেয়াল নেই। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি বিছানায় শুয়ে আছি, আর মিঃ ডেভিস একটা রিভলভারের নল আমার কপালে ঠেকিয়ে বলছে, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। নইলে এই রিভলভারের গুলি তোমার মগজ ফুটো করে বেরিয়ে যাবে।' এদিকে ভয়ে ঘামছি, একটা কথাও মুখ ফুটে বেরোচ্ছে না। শুধু মুখ থেকে একটা অস্ফুট গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

galporchhabi.blogspot.in

হঠাৎ কাকা আমাকে ঠেলল, 'এই বাদল, ওঠ, ওঠ, সকাল হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে অমন গোঁ গোঁ আওয়াজ করছিস কেন?'

ধড়মড় করে উঠে দেখলাম, কোথায় মিঃ ডেভিস!

ঘরের ভেতর কাকার পাশের বিছানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে আছি আমি।

৷৷ পাঁচ ৷৷

বিছানা ছেড়ে উঠে আমি আর কাকা বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, রাতের সেই কনস্টেবল দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। চারদিকে বোমার বিস্ফোরণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া জিনিসপত্র।

কাকা সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'কিরে বাদল, থাকবি, নাকি কলকাতা ফিরে যাবি?'

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলাম, 'তোমার সঙ্গেই থাকব।' দিনের আলোয় মনের সাহস আবার ফিরে আসছিল।

বেলা আটটা নাগাদ ফোন এলো। শিরীষ পাল ফোন করেছেন।

'মিঃ বোস, রাতে আর কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'না, তেমন কিছু হয়নি।'

'শুনুন, আজ বেলা এগারোটা নাগাদ কলকাতা থেকে ফরেনসিক এক্সপার্ট আসবেন। দয়া করে একটু সারকিট হাউসে থাকবেন। মাঝে কিছু দরকার হলে ফোন করবেন, নয় তো পাহারাদার কনস্টেবলকে বলবেন।'

'মিঃ পাল, আমি ভাবছি হাসপাতালে গিয়ে স্টেফানিয়নকে দেখে আসব। আপনি কি কোন জীপ পাঠাতে পারবেন?'

'আরে নিশ্চয়ই। আপনার জন্য তো আমাদের একটা জীপ রাখাই আছে। মিঃ নিগম বলে দিয়েছেন। একটু অপেক্ষা করুন। একটু পরেই পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা। স্টেফানিয়নকে কেমন দেখলেন, সে খবরটা দেবেন। শুনছি স্টেফানিয়নের অবস্থা নাকি বিশেষ ভালো নয়।'

'তাই নাকি! তাহলেই তো মুশকিল! স্টেফানিয়ন ভালো হয়ে উঠলে ওর কাছ থেকেই অনেক খবর পাওয়া যাবে।'

'সত্যি বড় চিন্তায় পড়া গেল!'

শিরীষ পাল ফোন ছেড়ে দিলেন।

ডাইনিং হলে তখনো লণ্ডভণ্ড অবস্থা। তবে এসব কিছু পরিষ্কার করা হবে না এখন, যাতে ফরেনসিক এক্সপার্টের কাজ করতে কোন অসুবিধে না হয়।

স্টেফানিয়নের বদলে সারকিট হাউসের দরোয়ান বাহাদুর চা টোস্ট দিয়ে গেল। ওকে সকালবেলাই কাকা বলে রেখেছিল।

galporjhuli.blogspot.in

দরোয়ানকে সারকিট হাউসের রেকর্ড বই আনতে বলল কাকা। রেকর্ড বই খুলে কিন্তু মিঃ ডেভিস বা আজিজুর রহমানের কোন নাম পাওয়া গেল না। তার বদলে অস্পষ্ট হিজিবিজি অক্ষরে অন্য দুজনের নাম রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি কিংবা কাকা কেউই নাম পড়তে পারলাম না। দরোয়ান রেকর্ড বই নিয়ে গেলে কাকা বলল, 'জানতাম। এরকম কিছু একটা হবে। ডেভিস, আজিজুর রহমান দুটোই ছদ্মনাম।'

'দেখলে তো কাকা, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, ঐ কালো অ্যামবাসাডারটাই আমাদের চাপা দিতে চেয়েছিল।'

'সত্যি প্রথম থেকে সাবধান না হয়ে দেখছি ভুল করেছি। যাক গে, এবার থেকে আরো গোপনে আমাদের কাজকর্ম চালাতে হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ এবার শুধু চালাক নয়, অনেক দুর্ধর্ষ।'

একটু পরেই আমাদের জন্য এসে গেল জীপ। জীপের ড্রাইভার কাকাকে নমস্কার করে বলল, 'আমার নাম কালীপদ পোড়েল। আপনার কাছে এবার থেকে ডিউটি দেব।'

তাকিয়ে দেখলাম, কালীপদর বয়েস কম, স্বাস্থ্যবান, রং কালো।

জীপে চেপে কাকা বলল, 'চল কালীপদ, সদর হাসপাতালে চল।'

সারকিট হাউসের বাইরে পুলিসের পাহারা। গেট দিয়ে বাইরে বেরোবার সময় দেখলাম, গেটের বাইরে উৎসুক মানুষজন। তবে ওদের মুখে চোখে ভয়ের ছাপ। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছে, কাল রাতে সারকিট হাউসে কী ভয়ংকর এক বিস্ফোরণ ঘটে গেছে।

সারকিট হাউস থেকে হাসপাতালে পৌঁছতে বিশেষ সময় লাগল না। পুলিস কেস বলে স্টেফানিয়নকে আলাদা একটা ছোট ঘরের মধ্যে রেখেছে। তাছাড়া ওর অবস্থাও বেশ সিরিয়াস। ওর ঘরে কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না। তবে আমরা পুলিসের তরফ থেকে গিয়েছি বলে ভেতরে ঢুকবার ছাড়পত্র পেলাম।

ঘরটা ছোট। একটা বিছানায় আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে স্টেফানিয়ন। মুখের একটা পাশ কালচে হয়ে আছে। একপাশে একটা মিটসেফ। তার ওপরে নানা ওষুধপত্র।

সঙ্গের নার্সকে জিজ্ঞেস করল কাকা, 'এখন অবস্থা কী রকম?'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা না কাটলে ঠিক বলা যাবে না। তবে মাঝে একবার জ্ঞান ফিরেছিল।'

ঐ ছোট ঘরে অচৈতন্য স্টেফানিয়নের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আর একটু হলে আমরাই তো এখানে অচেতন অবস্থায় শুয়ে থাকতাম। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আমাদের বদলে এখানে এখন স্টেফানিয়ন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জীপে উঠতে যাব, এমন সময় আর একটি জীপ আমাদের পাশে দাঁড়াল। সেই জীপ থেকে নামলেন শিরীষ পাল।

galpokolpachhobi.blogspot.in

শিরীষ পালের মুখ গম্ভীর।

'এই যে মিঃ বোস, আপনাকে ধরতেই হাসপাতালে এলাম। তারপর কেমন দেখলেন স্টেফানিয়নকে? কী বললেন ডাক্তার?'

'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে নার্সের মুখে শুনলাম, অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। আটচল্লিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না।'

'তবে তো মুশকিল। স্টেফানিয়ন বেঁচে উঠলে তবেই না ওর কাছ থেকে ঐ লোক দুটো সম্পর্কে খবরাখবর পাওয়া যাবে। এদিকে ঐ কালো অ্যামবাসাডারটা যে কোথায় কোনদিকে গেল, তার কোন হদিস এখনো পাওয়া গেল না। অথচ আশেপাশের সবকটা থানাকেই জানিয়ে রেখেছি।'

'আপনি তেজকুরি ক্যাম্প অঞ্চলের থানায় কি খবর দিয়েছেন?'

'ওদিকে তো ঝালদা থানা। ওখানে কালই খবর পাঠিয়েছি। তাছাড়া তেজকুরি ক্যাম্পে তো আমার লোকজন সারা দিনরাত পাহারা দিচ্ছে।'

সদর হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ভিড়ও বাড়ছে। কাকা ঘড়ি দেখল।

'প্রায় দশটা বাজে। আপনার ফরেনসিক এক্সপার্টের আসবার সময় হলো। সারকিট হাউসের দিকে যাবেন নাকি?'

'এলে তো আমার অফিসেই আগে আসবেন। বরং আমার অফিসের দিকেই চলুন।'

জীপে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, একটা কালো অ্যামবাসাডার আমাদের দিকেই আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ঐ তো ব্ল্যাক অ্যামবাসাডার।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে কাকা আর মিঃ পাল একসঙ্গে বলে উঠল, 'কোথায়?'

আমি আঙুল তুলে দেখাবার আগেই কালো অ্যামবাসাডারটা আমাদের সামনে এসে থেমে গেল। গাড়ির ভেতরে উঁকি মেরে যেন খুব লজ্জা পেয়েছেন, এমন গলায় বললেন শিরীষ পাল, 'গুড মরনিং স্যার!'

আমাদের দিকে ফিরলেন মিঃ পাল, 'আসুন মিঃ বোস আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—'

ইতিমধ্যে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছেন দীর্ঘকায় ব্যক্তিত্বময় এক ভদ্রলোক। ফরসা। চোখে চশমা আছে। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়।

মিঃ পাল বললেন, 'মিঃ নিগম, আমাদের এস পি সাহেব। আর ইনি মিঃ সৃজন বোস—'

মিঃ পাল কথা শেষ করবার আগেই মিঃ নিগম ইংরেজিতে বললেন, 'আরে আপনিই মিঃ সৃজন বোস। সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেটর। আপনার কথা লিখেছেন কলকাতার পুলিস কমিশনার সেন সাহেব। ভালোই হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে।'

একটু থেমে মিঃ নিগম ফিরলেন শিরীষ পালের দিকে, 'মিঃ পাল, ডঃ চ্যাটার্জীর

galpochhabi.blogspot.in

ব্যাপারে আপনি তাহলে মিঃ বোসের সাহায্য নিন। কেমন! মিঃ বোস, একদিন আমার অফিসে আসুন, কথাবার্তা হবে। চলি তাহলে। বাই বাই।'

—ঐ তো ব্ল্যাক অ্যামবাসাডার (পৃঃ ২২)

মিঃ নিগমের কালো অ্যামবাসাডার চলে গেল।

আমরা জীপে চেপে শিরীষ পালের অফিসের দিকে গেলাম। হাসপাতালের

galpornchhabi.blogspot.in

খুব কাছে সাহেব বাঁধের কাছে ওর অফিস। অনেকটা জমিজায়গা নিয়ে একতলা বাড়ি। একপাশে ছোট বাগান। সেখানে বেশ কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকার গাছ। তাতে লাল, হলুদ, গোলাপী নানা রংয়ের চন্দ্রমল্লিকা।

শিরীষ পালের ঘর বেশ সাজানো গোছানো। টেবিলের ওপরে দু' দুটো টেলিফোন। একটা বোধহয় পুলিসের নিজস্ব পি বি এক্স বোর্ডের সঙ্গে লাগানো। আর একটা সাধারণ টেলিফোন। ওর ঘরের পাশেই ওয়্যারলেস ঘর। ওয়্যারলেসে খবর আসছে আর যাচ্ছে। শিরীষ পালের ঘরে বসে থাকতে থাকতে আমরা নানা ধরনের বিপ্-বিপ্ আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

'তাহলে বলুন মিঃ বোস, সমস্ত কেসটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

একটা চুরুট ধরিয়ে জবাব দিল কাকা, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, এ কেস খুব জটিল। তাছাড়া আমাদের প্রতিপক্ষ মোটেই দুর্বল নয়, বরং বেশ জবরদস্ত। যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয় ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জী তেজকুরির জঙ্গলে কাজ করতে করতে প্রচুর ইউরেনিয়াম আকরিকের হদিস পেয়ে যান। তার ফলেই যত বিপত্তি। মনে হয় কেউ ওকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে ঐ গোপন ইউরেনিয়াম আকরিকের খোঁজ জানবার জন্য।'

মিঃ পাল বললেন, 'তাই নাকি! কিন্তু আমি তো শুনেছি, ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই নাকি ঘটনাটা ঘটেছে।'

'আরে কি যে বলেন, ওর মতো শান্ত, ধীরস্থির লোকের সঙ্গে কার শত্রুতা থাকবে?'

'আপনার সঙ্গে হীরেন ভৌমিকের পরিচয় হয়েছে? ওঁর মুখে শুনেছি, ওঁদের ক্যাম্পে একজন টেকনিশিয়ান কাজ করত। নাম রুবেন সিংহ। ডঃ চ্যাটার্জীর রিপোর্টের ভিত্তিতে নাকি রুবেন সিংহের চাকরি যায়। হীরেন ভৌমিক যদিও সরাসরি কিছু বলেননি, তবু ওঁর কথাবার্তা থেকে মনে হয়, ডঃ চ্যাটার্জীর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে রুবেন সিংহের কোন যোগাযোগ থাকতে পারে। হীরেনবাবুর মুখে শুনেছি চাকরি চলে যাওয়ার পরে নাকি রুবেন সিংহ একদিন এসে ডঃ চ্যাটার্জীর ওপরে খুব হম্বিতম্বি করে যায়।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! অথচ হীরেনবাবু আমার কাছে এসব কিছুই বলেননি।'

'আমাকেও কি আর নিজের থেকে বলেছেন! অনেক জেরা করে বার করতে হয়েছে।'

'তাই নাকি! লোকটির চরিত্র কিন্তু বেশ জটিল। এর ওপরেও নজর রাখতে হবে।'

'তা আমার লোক রাখছে। এইজন্যই তো ক্যাম্পে পাহারা বসিয়েছি। ঐ ক্যাম্পের প্রত্যেকটি লোকই মশাই একটি চরিত্র।' কথা শেষ করে হা হা করে হাসতে লাগলেন শিরীষ পাল।

galpordchhabi.blogspot.in

সৃজনকাকাকে একটু চিন্তিত মনে হলো। ওর গম্ভীর মুখ দেখে মনে হয়, ওর মনের হিসেবগুলো সব যেন বদলে ফেলতে হচ্ছে।

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে কাকা বলল, 'আচ্ছা মিঃ পাল, ঐ রুবেন সিংহের কোন খোঁজ পেয়েছেন?'

'আরে পেলে তো ঝামেলা চুকেই যেত। রুবেন সিংহকে জেলখানায় পুরে ফাইলে লিখে দিতাম, ফাইল ক্লোজড। কিন্তু রুবেন সিংহ যে কোথায় গেছে, কেউ জানে না। রুবেনের বাড়ি ছিল শিলং-এ। কিন্তু মেঘালয় পুলিসের কাছ থেকে খবর এসেছে, রুবেনের বাবা শিলংয়ের বাড়ি বিক্রি করে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না।'

'ওর কোন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ পাওয়া গেল না?'

'থাকলে তো পাওয়া যাবে! সংসারে রুবেনের বাবা আর মা ছাড়া আর কেউ নেই। নিজে তো বিয়েই করেনি রুবেন।'

'হ্যাটস অফ টু ইউ। আপনি তো দেখছি এই কেস সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর যোগাড় করেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে আবার নতুন করে আমাকে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে।'

'তা করুন। তবে চিন্তার কিছু কিছু ভাগ আমাকেও দেবেন।' হাসতে হাসতে বললেন শিরীষ পাল।

একটু পরেই একটা জীপ এসে থামল বাইরে। জীপ থেকে নেমে দু'জন ভদ্রলোক ঢুকলেন আমাদের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন শিরীষ পাল, আরে আসুন ডঃ মুখার্জী, আসুন—'

ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ মুখার্জী ও তাঁর অ্যাসিসট্যান্টের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো। কাকার সঙ্গে ডঃ মুখার্জীর কথাবার্তা হলো কিছুক্ষণ। কাকা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল, কীভাবে কী পরিস্থিতিতে সেদিন বোমা ফেটেছিল। আমরা যে তখন ফোন করতে গিয়েছিলাম, তাও বলতে ভুলল না কাকা।

শিরীষ পাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'মিঃ বোস, আপনিই বরং ডঃ মুখার্জীকে সারকিট হাউসে নিয়ে যান। আমি কয়েকটা জরুরি কাজ সেরে খানিকক্ষণ পরেই যাচ্ছি।'

সারকিট হাউসের গেটে পৌঁছে দেখলাম, গেটে লোকের ভিড় তেমন নেই, অনেকেই যে যার বাড়িতে ফিরে গেছে। সারকিট হাউসের সমস্ত কমপাউণ্ডটা ঘুরে দেখলেন ডঃ মুখার্জী। তারপর বাড়ির ভেতরটা। ডাইনিং হলের ভগ্নস্তূপের ছবিও তোলা হলো। ফিংগার প্রিন্টের ছবিও তুললেন ওঁরা। সেই ভগ্নস্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে বোমার কয়েকটা টুকরো, ছেঁড়া সিগারেটের অংশবিশেষ সংগ্রহ করলেন। সমস্ত কাজকর্ম সারতে লাগল ঘণ্টা দুয়েক।

'যাবার আগে মিঃ মুখার্জী বললেন, 'এসব নিয়ে আজই ফিরে যাচ্ছি কলকাতা।

galpochhabi.blogspot.in

আশা করি তিন চার দিনেই আমাদের রিপোর্ট দিতে পারব। তবে একটা কথা বলে যাই, বোমাটা প্রচণ্ড শক্তিশালী, মনে হচ্ছে দেশী নয়, বিদেশী। যাক, আজ চলি।'

করমর্দন করে বিদায় নিলেন ওঁরা।

ওঁরা চলে গেলে কাকা নিজেই এবার ডাইনিং হল, মিঃ ডেভিস ও রহমানের ঘরে কী সব পরীক্ষা করল। ওদের ঘরে একটা সাদা নোট স্লিপ পাওয়া গেল। তাতে একটা নম্বর ছাপানো—০১৬৮৫১৩২। কিসের নম্বর কে জানে? টেলিফোন নম্বর তো নয়। আরো আশ্চর্যের কথা, এই নম্বরটাই আমাদের শাসানির চিঠিতে ছাপানো ছিল। নম্বর ছাপানো সাদা স্লিপটা সযত্নে পকেটে রাখল কাকা। তারপর নিজের নোটবইতে কীসব লিখতে শুরু করল। এসব কাজে কাকার মনোযোগ দারুণ। কী একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ধমক খেলাম কাকার কাছে। কাকার মুড আজ বেশ খারাপ।

বিকেলে বাইরের বাগানে পায়চারি করছি আমি। রাস্তায় দেখলাম একজন খবরের কাগজওলাকে। ওর কাছে কাগজ কিনে দেখি, সূর্যকাকার স্ত্রীর সঙ্গে এক সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। অনুরাধা কাকীমা সরকারের কাছে করুণভাবে আবেদন করেছেন, যাতে সরকার তাঁর স্বামীকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করে দেন। খবরটা পড়ে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল।

কাকাকে খবরটা দেখাবার জন্য বাংলোর ভেতরে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিলের ওপর একগাদা কাগজপত্র ছড়ানো। গভীর মনোযোগে কাকা সেসব কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছে। টেবিলের ওপর আমাদের শাসিয়ে লেখা চিঠিটাও আছে।

কাকার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কাকা, এই যে খবরটা বেরিয়েছে—'

কাকা নীরবে আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ল, তারপর ফেরত দিয়ে দিল আমাকে। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু কাকা কিছুই বলল না। তাই কী আর করব, কাগজটা হাতে নিয়ে আবার বাইরের বাগানে ঘুরতে বেরোলাম।

এমন সময় দেখি, শিরীষ পালের জীপ গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। আমাকে বাগানে ঘুরতে দেখে মিঃ পাল জীপ থেকে নামলেন।

'এই যে বাদল, কাগজে আজ ডঃ চ্যাটার্জীর স্ত্রীর সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। তোমার কাকা দেখেছেন?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'দেখেছেন, কিন্তু কিছুই তো বললেন না। কাকা এখন ভেতরে কীসব কাগজপত্র খুলে বসেছেন।'

'তাহলে এখন চলি, পরে এক সময় আসব।'

'না না, ভেতরে চলুন, না হলে কাকা খুব রাগ করবেন আমার ওপর।'

মিঃ পালকে দেখে কাগজপত্র সরিয়ে উঠে দাঁড়াল কাকা, 'আসুন মিঃ পাল, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আপনার সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে।'

তারপর দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে নিচু গলায় কীসব আলোচনা করল

galporchhabi.blogspot.in

অনেকক্ষণ ধরে। আমি বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে তাকিয়ে রইলাম দূরের শাল-পলাশের অরণ্যের দিকে। এখন বসন্তকাল। দূরের ঐ সবুজ অরণ্যের শরীরে কারা যেন আবিরের লাল ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। ফিরোজা নীল আকাশের নিচে লাল সবুজ অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেলাম ইউরেনিয়াম চোরদের কথা।

চমকে উঠলাম কাকার ডাকে, 'কিরে, কী এত ভাবছিস? তখন থেকে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলাম যে।'

'মিঃ পাল কোথায়?'

'উনি চলে গেছেন। চল, খেতে চল।'

॥ ছয় ॥

ডাইনিং হলে গিয়ে দেখলাম, আগের বড় টেবিলের বদলে একটা ছোট টেবিল দিয়েছে। সঙ্গে গোটা চারেক চেয়ার। বাহাদুর কাকা আর আমার খাবার দিয়েছে।

খেতে খেতে কাকা বলল, কলকাতায় তো এখন ফিরতে পারছি না। কাল ভোরে আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। দিনকয়েক থাকতেও হবে হয়তো। যাবি?'

'সঙ্গে কে কে যাচ্ছে?'

'কে আবার? আমি আর পাল। তা ছাড়া সঙ্গে দু তিনজন কনস্টেবলও থাকবে।'

'কেন? মিঃ ভৌমিককে নিচ্ছ না?'

'না। ওকে জানানো হবে না বলেই তো এই অ্যাডভেনচার।'

'যদি জানতে পেরে যায়?'

'জানতে পারলে জানবে।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে তো যন্ত্রপাতি নেই?'

'কাল ট্রাংকল করে দিয়েছি। আজ রাতের মধ্যে গাইগার কাউনটার, এরিয়াল ফটোগ্রাফ ও আরো কিছু দরকারী জিনিসপত্র সারকিট হাউসে পৌঁছে যাবে। ভেবে দেখ, কাল সকালে আমাদের সঙ্গে যাবি কি না?'

'এতে আর ভাববার কি আছে? তুমি যেখানে যাবে, সেখানে আমি তো যাবই।'

'কিন্তু বেশ বিপদের সম্ভাবনা আছে!'

'তাতে তুমি যদি ভয় না পাও, তবে বাদল বোসও পাবে না।'

'উরি ব্বাবা, তুই যে দেখছি বড় মানুষদের মতো কথা বলতে শিখেছিস।'

'বারে, এত চোর গুণ্ডাদের শায়েস্তা করলাম। এখনো কি সেই ছোট থাকব নাকি।'

'আচ্ছা কাকা, তোমার কি হীরেন ভৌমিককে সন্দেহ হয়?'

'খুবই।'

galporchhabi.blogspot.in

'তবে ওকে গ্রেপ্তার করাচ্ছ না কেন?'

'ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? তা ছাড়া ওকে গ্রেপ্তার করলে ওর দলের লোকজন সাবধান হয়ে যাবে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কাকা বলল, 'তুই বরং সারকিট হাউসে বিশ্রাম নে। আমি একটু মিঃ নিগমের অফিস থেকে ঘুরে আসছি।'

বেরোনোর আগে কাকা বারবার সাবধান করে দিয়ে গেল, 'দরজা বন্ধ করে ভেতরে থাকবি। কেউ কড়া নাড়লেই ঝট্ করে দরজা খুলবি না। আমি ফিরলে দরজায় তিনবার টোকা দেব।'

জীপে করে কাকা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে একটা বই নিয়ে শুলাম। আগাথা ক্রিস্টির গল্প সংকলন। অনেকগুলো ডিটেকটিভ গল্প আছে। গল্পগুলো খুবই ইণ্টারেস্টিং। তবু পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা খেয়াল নেই।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুপুরবেলা একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, আমি, কাকা আর শিরীষ পাল এক গভীর বনের ভেতরে ইউরেনিয়ামের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পোর্টেবল গাইগার কাউনটার প্রত্যেকটা পাথরের ওপর রেখে, কাকা তার ভেতরে ইউরেনিয়ামের ভাগ পরীক্ষা করে দেখছে। কিন্তু কাকার দুর্ভাগ্য, কোথাও তেমন ইউরেনিয়ামের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কাকার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পরম উৎসাহে পাথর ভেঙে দেখে যাচ্ছি, যদি হলদে কালচে পাথরের দেখা মেলে। ওদিকে শিরীষ পাল হাতে রিভলভার বাগিয়ে অদৃশ্য কিডন্যাপারদের মোকাবিলা করে যাচ্ছে।

খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় দেখি, কাকার বইয়ের মতো অবিকল হলদে কালচে পাথর। কাকার হাত থেকে গাইগার কাউনটার যন্ত্রটা পাথরের ওপর বসাতেই যন্ত্রের কাঁটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, 'কাকা, এইদিকে—এখানে—'

আমার চিৎকার শুনে কাকা ছুটে আসছিল। হঠাৎ দেখলাম, কাকা নেই। কাকার বদলে হীরেন ভৌমিক আমার দিকে ছুটে আসছে। হাতে রিভলভার। ওদিকে শিরীষ পালও শিশিরের মতো হওয়ায় উবে গেছে। তার বদলে একটি অপরিচিত লোক। হাতে একটা ছোরা।

হীরেন ভৌমিক চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই রুবেন—'

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেখলাম, হীরেন ভৌমিক আর ঐ লোকটা, বোধহয় রুবেন সিংহ, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'কাকা—'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল আমার। শুনতে পেলাম, দরজায় সজোরে তিনবার ধাক্কা। ও, তাহলে কাকা ফিরে এসেছে। আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছি সারকিট হাউসের ঘরে।

galporchhabi.blogspot.in

দরজা খুলে দিলাম। কাকা দাঁড়িয়ে। চিন্তিত মুখ।

'কিরে! কী হয়েছে। দশ মিনিট ধরে ধাক্কা দিচ্ছি। ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?'

ভীতু গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জান কাকা, আজ একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, ঐ হীরেন ভৌমিক আর রুবেন সিংহ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।'

'রুবেন সিংহকে চিনলি কী করে? ওকে কি দেখেছিস নাকি?'

'হীরেন ভৌমিক তো ঐ নামেই ডাকল ওকে।'

'যাক, তুই তো আমার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে গেছিস। রুবেন সিংহের সঙ্গেও তোর মোলাকাত হয়ে গেছে।' কাকা আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, বিকেল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দূরে রক্তিম শাল-পলাশের জঙ্গলের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রাস্তার পাশে ঝাঁকড়া শিরীষ গাছের মাথায় পাখ-পাখালির জটলা। কলকাতা ছেড়ে কতদিন বাইরে আছি। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

কাকা বলল, 'মনে আছে তো। কাল ভোরে আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি।'

'মনে নেই আবার। এত বেশি মনে আছে বলেই তো স্বপ্ন দেখলাম।'

একটু থেমে আবার বললাম, 'কাকা, তোমার যন্ত্রপাতির বন্দোবস্ত হয়েছে?'

'বারে, দেখলি না আমার হাতে কিটব্যাগ। ওতেই সব কিছু আছে।'

'কাকা, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছি। অযোধ্যা পাহাড়ে যাচ্ছ কেন তা তো বললে না?'

'বলব, বলব। সব বলব তোকে। তবে এখন জেনে রাখ, আমাদের শাসানির চিঠিতে যে নম্বর বা ০১৬৮৫১৩২ লেখা আছে, সেই নম্বর থেকেই হদিস পেয়েছি একটা।' কথা শেষ করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো বললাম, 'তবে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার।'

পরের দিন ভোরে মুরগির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, কাকা আগেই উঠে পড়েছে। জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। একটু লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। কাকার পরনে টাইট জিনের ট্রাউজার, অনেকগুলো পকেটওলা খাকি শার্ট। সঙ্গে কাঁধে ঝোলানো কিট-ব্যাগ। শার্টের একটা পকেট থেকে রিভলভার বের করে দেখাল কাকা।

আমি একটু অবাক হলাম, 'তুমিই না বলেছিলে, জঙ্গলে ইউরেনিয়াম খুঁজতে যাচ্ছ। ওখানে রিভলভার কী কাজে লাগবে?'

কাকা হাসল, 'তুই তো কাল স্বপ্ন দেখলি, ঐ জঙ্গলে হীরেন ভৌমিক আর রুবেন সিংহ আমাদের পিছু নিয়েছে। ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে না?'

'তুমি কি তাহলে স্বপ্নটা সত্যি বলে ধরে নিচ্ছ?'

galpochhabi.blogspot.in

'না, তা ঠিক নয়। তবে নিজেদের তৈরি রাখা ভালো। অবশ্য আমাদের সঙ্গে শিরীষ পালের দুজন কনস্টেবলও যাচ্ছে সাদা পোশাকে।'

বলতে না বলতে শিরীষ পাল এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। শিরীষ পাল বললেন, 'মিঃ বোস। আই অ্যাম ভেরি সরি। আপনার সঙ্গে যেতে পারছি না। একটা জরুরি কেসে আজই আমাকে যেতে হচ্ছে রঘুনাথপুরে। মিঃ নিগমের নির্দেশ। কী আর করব বলুন! তবে আপনার সঙ্গে একজন কনস্টেবল দিয়ে দিচ্ছি। ড্রাইভারকে বলা আছে। একটু পরেই আপনার কাছে এসে রিপোর্ট করবে। প্লিজ ডোণ্ট মাইন্ড, মিঃ বোস।'

মনে হলো, শিরীষ পালের কথা শুনে সৃজনকাকা একটু মিইয়ে গেল। কিন্তু তবু মুখে শুখনো হাসি ফুটিয়ে বলল কাকা, 'না, না, এতে মনে করবার কি আছে! ওপরওলার নির্দেশ, সে তো আপনি অমান্য করতে পারেন না। সে যাই হোক, আপনি যাচ্ছেন না, তাই আমাদের প্রোগ্রাম একটু পালটাতে হবে।'

কাকার কথায় শিরীষ পালের মুখ করুণ।

ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'চলি তাহলে মিঃ বোস। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

মিঃ পাল বেরিয়ে গেলে বললাম, 'শিরীষ পাল কি ভয় পেয়েছেন?'

'কে জানে! তবে হওয়াটা আশ্চর্য নয়। তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে সারাদিন টো-টো করে ঘুরতে কার আর ভালো লাগে!'

সকালের জলখাবার দিয়ে ডেকে গেল বাহাদুর। তাছাড়া সঙ্গে নেবার জন্য দু'প্যাকেট জলখাবারও।

সকালের জলখাবার খেতে খেতে বলল কাকা, 'শোন বাদল, তুই তোর বাইনোকুলারটাও সঙ্গে নিয়ে নিস।'

'কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে বাইনোকুলার নিয়ে কতদূর আর দেখা যাবে?'

'তবু সঙ্গে নিয়ে নিস। বলা যায় না, কাজে লাগতে পারে।'

একটু পরেই কালীপদ পোড়েল এলো জীপ নিয়ে। সঙ্গে একজন লোক।

লোকটা নমস্কার করে বলল, 'আমার নাম কালীমুদ্দি। মিঃ পাল পাঠালেন আমাকে।'

কাকা বলল, 'ঠিক আছে, বাইরে একটু দাঁড়াও। আমরা একটু পরেই আসছি।'

ওরা দুজন বেরিয়ে যেতেই আমি বললাম, 'এবার আমাদের এক্সপেডিশন সফল হবেই। সঙ্গে দু'জন কালী। কালীপদ আর কালীমুদ্দি। আমাদের দেখে কে!'

আমার পিঠ চাপড়ে দিল কাকা, 'বাঃ, দারুণ বলেছিস তো!'

আমাদের জিনিসপত্র ধরাধরি করে জীপে তুললাম। কালীমুদ্দি ও কালীপদ সাহায্য করল।

কাকা জিজ্ঞেস করল কালীমুদ্দিকে, 'কোথায় কী কাজে যাচ্ছি জান তো?'

galpochhabi.blogspot.in

'না তো। পাল সাহেব তো কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন আপনার সঙ্গে যেতে।'

কালীমুদ্দির কথা শুনে কাকা তো হতভম্ব। কোথায় কী কাজে যাচ্ছে, তাই জানে না, এ আমাদের সাহায্য করবে কি! স্থানীয় লোককে নেওয়া এই জন্য যে, জঙ্গলে পাহাড়ী জায়গায় রাস্তা চেনাবে, বিপদে-আপদে সাহায্য করবে। তবু কী আর করা! ওদের নিয়েই যাত্রা শুরু করলাম।

॥ সাত ॥

জীপ চালাচ্ছে কালীপদ। মাঝখানে আমি, ধারের দিকে সৃজনকাকা। পেছনে আমাদের মালপত্র নিয়ে কালীমুদ্দি। কাকা রাস্তার নির্দেশ দিল কালীপদকে। আমাদের জীপ যাবে প্রথমে জামশেদপুরের রাস্তায়, তারপর ডান দিকে বেঁকে সিরকাবাদ, সেখান থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায়।

কাকাকে যে কথাটা কাল থেকেই জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি, সেই কথাটাই বললাম, 'কোথায় যাচ্ছি, তাতো জানলাম, কিন্তু কেন যাচ্ছি, কী পাব সেখানে? সূর্যকাকাই বা কোথায়, নম্বরের রহস্যই বা কি, এ সব কিছুই তো বলনি আমাকে।'

নিজস্ব ভঙ্গিতে আমার কথা একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিল সৃজনকাকা, 'আরে জানবি, নিশ্চয়ই সব জানবি। যখন সময় আসবে সব কিছু বলব।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সিরকাবাদ পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা বেশ বড়, ব্লক অফিস ও হাসপাতাল আছে। সিরকাবাদ পর্যন্ত সমতল, এরপর থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের শুরু। ধূসর সবুজ পাহাড় সমস্ত আকাশ জুড়ে। পাহাড়ী বন্ধু নদী পেরিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়।

সিরকাবাদে জলটল খেয়ে পাহাড়ী রাস্তায় পাড়ি দিলাম আমরা। কাকার দিকে চেয়ে দেখলাম, মুখ গম্ভীর, কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন যেন। মাঝে মাঝে চিন্তা-ক্লিষ্ট চকিত দৃষ্টি ফেলছিল আশেপাশে। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছিল। রাস্তার দু'পাশে শাল সেগুনের জঙ্গল। মাঝে আম, কাঁঠাল, বহরা গাছের সার। কিছু কুঁড়েঘর, লোকজন। আমাদের জীপের শব্দে অনেকেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বৃদ্ধ, শিশু, নারী। জনকয়েক আদিবাসী যুবককে চোখে পড়ল, জঙ্গলের মধ্যে গাছ কাটছে। জঙ্গলের কাঠই ওদের জ্বালানী।

আধঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের মাথায় একটা বাংলোয় পৌঁছলাম। জীপ থেকে নেমে কাকা বলল, 'কিরে, পছন্দ হয়েছে বাংলো?'

তাকিয়ে দেখলাম, অপূর্ব সুন্দর বাংলো। লাল টালির ছাদ, বাংলোর গা বেয়ে বেগেনভেলিয়ার লতা ছাদে উঠে গেছে। লাল, বেগুনি রংয়ের ফুল। ছেয়েছে সমস্ত দেয়াল। বাংলোর চারদিকে সুন্দর ফুলের বাগান। দেখে আমি মুগ্ধ।

galpochhobi.blogspot.in

'বারে, এত সুন্দর বাংলোয় থাকব নাকি আমরা। আর তুমি আমাকে এখানে আনতেই চাওনি।'

সুন্দর বাংলোয় শুধু রাতেই শোব। বাকি সময়টা তো কাটবে জঙ্গলেই টো-টো করে। তাছাড়া তোর স্বপ্নের ডাকাতগুলো তো আছেই।'

'তার মানে সেই হীরেন ভৌমিক আর রুবেন সিংহ?'

'না, ওদের কথা বলছি না। তবে ওদেরই মতো কেউ হয়তো। মিঃ ডেভিস কিংবা আজিজুরও হতে পারে।'

'তাই নাকি?' আমার গলার স্বরে ভয়ের ছোঁয়াচ।

'আরে কোন ভয় নেই।' কাকা নিজের জামার পকেটে গোপন রিভলভারে হাত দেয়।

আমি বলি, 'তাছাড়া রয়েছে আমাদের দুই কালী।'

একটু পরেই বাংলোর চৌকিদার এলে পকেট থেকে রিজার্ভেশন স্লিপ বের করে চৌকিদারের হাতে দেয় কাকা। বাংলোর ভেতরে আমাদের ঘরটা খুব সুন্দর। ঘরে দুটো সিঙ্গল খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, লেখবার টেবিল, চেয়ার।

টেবিলের ড্রয়ার টেনে খুলতেই চোখে পড়ল দামী বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট। ক্যামেল মার্কা সিগারেট। কাকা সিগারেটের প্যাকেটটা ভালো করে দেখে বলল, 'এ তো দেখছি আমেরিকান সিগারেটের প্যাকেট। আশ্চর্য, এখানে আমেরিকান সিগারেটের প্যাকেট এলো কী করে! তাছাড়া প্যাকেট দেখে খুব বেশি পুরনো মনে হচ্ছে না।'

ডাইনিং হলে কী সব ঠিকঠাক করছিল চৌকিদার। কাকা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এই ঘরে কি কোন আমেরিকান সাহেব ছিল?'

কাকার কথায় একটু যেন থতমত খেল চৌকিদার, 'না হুজুর। তবে দু'জন সাহেব ছিলেন। একজন ফর্সা সাহেব।'

চৌকিদারের উত্তর শুনে কী যেন ভাবতে লাগল সৃজনকাকা, তারপর বলল, 'ওরা কী করে এসেছিল? তারপর কোথায় কোন্‌দিকে গেল?'

'ওরা কোন্‌দিকে যে গেল, তা তো জানি না হুজুর। তবে ওদের সঙ্গে সাদা মোটর গাড়ি ছিল।'

'ব্ল্যাক অ্যামব্যাসাডার নয়,' আমি হতাশ কণ্ঠে বলি।

'তুই কি ভাবছিস, ওদের কেবল একটাই গাড়ি!'

চৌকিদার একটু অবাক হয়ে আমাদের কথাবার্তা শোনে, কিন্তু কোন মানে খুঁজে পায় না।

সৃজনকাকা ঘরে এসে কিট-ব্যাগ থেকে দু'তিনটে ম্যাপ বের করে। একটা সারভে অফ ইন্ডিয়ার টোপো শিট। এই ম্যাপে এই অঞ্চলের পাহাড়, নদী, গ্রাম, শহর, সব দেখানো আছে। আর দুটো আকাশ থেকে তোলা এরিয়াল ফটোগ্রাফ। এরিয়াল ফটোগ্রাফের সঙ্গে আমি তো আগে থেকেই পরিচিত। সেই আন্দামান অভিযানের

galpormhfa.blogspot.in

সময় অনেক কাজে লেগেছিল এই এরিয়াল ফটোগ্রাফ। কাকার কিট-ব্যাগ থেকে বেরোলো স্টিরিয়োস্কোপ। স্টিরিয়োস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখলাম, বিস্তৃত এক বনভূমির মাঝখানে পাহাড়ের ওপর আমাদের এই বাংলো। একপ্রান্তে সিরকাবাদ, আর একপ্রান্তে বাঘমুণ্ডী। কাকা পেনসিল দিয়ে দেখাল সূর্যকাকার ক্যাম্পের জায়গাটা। এরিয়াল ফটোগ্রাফ আগে তোলা বলে ক্যাম্পটা ছবিতে আসেনি।

পরের দিন ভোরে সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে আমরা বেরোবার জন্য তৈরি। বেরোবার আগে রিভলভার বের করে পরীক্ষা করে নিল কাকা। যে রকম ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে এসেছি, তাতে রিভলভার ছাড়া চলে না। কালীপদকে কাছে ডেকে আস্তে আস্তে কী যেন বলল কাকা, ঠিক শুনতে পেলাম না।

আমাদের সঙ্গে চলল কালীমুদ্দি। ওর হাতে একটা পাকা লাঠি, তাছাড়া কাকার কয়েকটা জিনিসপত্র। কাকার হাতে গোটা কয়েক ম্যাপ।

আমরা তিনজন বাংলো ছাড়িয়ে জংগলের রাস্তা ধরলাম। অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় মালভূমিতে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। চলতে চলতে কাকা বারবার হাতের ম্যাপ খুলে কী যেন দেখছিল, আর পাথর-টাথর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছিল। কিন্তু সে সবে আমার বিশেষ রুচি ছিল না, আমি মাঝে মাঝে সঙ্গের বাইনোকুলারে আশেপাশের দৃশ্য দেখছিলাম। বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে খুবই মজা, কারণ এভাবে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিট দূরের দৃশ্যও আমার খুব কাছের বলে মনে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে বাংলো থেকে প্রায় তিন-চার কিলোমিটার দূরে চলে গিয়েছি। বাইনোকুলারের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ল, প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে পাহাড়ের গায়ে বেশ বড়-সড় একটা গুহা। শুধু তাই নয়, মনে হলো কে যেন সেই গুহার মধ্যে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম কাকার কাছে। কাকা তখন পাথরের ওপরে গাইগার কাউণ্টার বসিয়ে পাথরের ভেতরে ইউরেনিয়ামের ভাগ পরীক্ষা করছে। কাউণ্টারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাকা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগ্য আজও ভালোই দেখছি—'

ফিসফিস করে বললাম, 'কাকা, আস্তে—'

বাইনোকুলারের ভেতর দিয়ে কাকাকে দূরে পাহাড়ের গায়ে গুহাটা দেখালাম। কাকা আমার হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে নিল। তারপর নিজেই ভালো করে দেখতে লাগল দূরের গুহাটা। কাকার মুখ বেশ গম্ভীর। খানিকক্ষণ দেখে আমার হাতে ফেরত দিয়ে দিল বাইনোকুলার। কিন্তু কোন কথা বলল না।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'ওদিকে যাব তো আমরা?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ কালীমুদ্দি চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে দেখুন, আকাশে হলুদ এরোপ্লেন—' কালীমুদ্দি কথা শেষ করতে পারে না উত্তেজনায়। আমি আর কাকা সঙ্গে সঙ্গে

galpochhabi.blogspot.in

আকাশের দিকে তাকাই। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। শুধু শুনতে পাই এরোপ্লেনের অস্পষ্ট ধ্বনি।

কাকা বলল, 'আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, ছোটখাট কোন মথ এরোপ্লেন। কাছেই রাঁচীর এরোড্রোম। মনে হয় ওদিক থেকেই এসেছে।'

কাকার কথায় কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করি। যাক, তাহলে কোন বদমায়েশ লোকের কারবার নয়।

কিন্তু পর মুহূর্তেই চমকে উঠে দেখলাম, আমাদের দু'পাশে দুটি লোক। দুজনের হাতেই উদ্যত রিভলভার। ওদের পরনে অদ্ভুত সবুজ পোশাক।

চাপা নির্মম গলায় ওরা হিসহিস করে উঠল, 'হ্যান্ডস আপ—'

সঙ্গে সঙ্গে আমি আর কাকা আস্তে আস্তে হাত তুললাম সমর্পণের ভঙ্গীতে। কিন্তু পেছন থেকে কালীমুদ্দি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের ঘাড়ে। ওর হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ল মাটিতে। তারপর শুধু এক সেকেন্ডের ব্যবধান। কাকা আর আমি একসঙ্গে অন্য লোকটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই লোকটা কুপোকাত। এক ঝটকায় ওর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিল কাকা।

ওদিকে কালীমুদ্দির সঙ্গে তখন অন্য লোকটির প্রাণপণ লড়াই। এ লোকটির ভার আমার ওপর দিয়ে কাকা গেল কালীমুদ্দিকে সাহায্য করতে। আমার হাতে রিভলভার। তাই লোকটি হাত তুলে বাধ্য ছেলের মতো বসে আছে। অন্য লোকটিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে কাকা আর কালীমুদ্দি। তারপর এই লোকটিকে বাঁধতেই বা কতক্ষণ!

কালীমুদ্দির বুদ্ধি আর তৎপরতায় সমস্ত ব্যাপারটি ঘটতে মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগল না।

কাকা কালীমুদ্দির পিঠ চাপড়ে দেয়, 'সত্যি কালীমুদ্দি, তুমি না থাকলে যে কী অবস্থাই হতো!'

'কিন্তু কাকা, এ দুটো লোককে নিয়ে কী করবে এখন?'

'তাই তো ভাবছি—'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কালীমুদ্দি, 'এ দুটো লোককে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে বাংলো পর্যন্ত নিয়ে চলুন। তারপর সেখান থেকে পুরুলিয়া। ওখানে মিঃ পালের মারের চোটে সব কথা বেরিয়ে আসবে—'

'ঠিক বলেছ, আপাতত লোক দুটোকে নিয়ে বাংলোয় ফেরা যাক।'

হঠাৎ কালীমুদ্দি চেঁচিয়ে উঠল, 'শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, ওরা গুলি চালাচ্ছে—'

সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়লাম আমরা। পাথরের পাশ দিয়ে দু একটা গুলি বেরিয়ে গেল। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি আমরা।

কালীমুদ্দি ফিসফিস করে বলল, 'চলুন, বুকে হেঁটে পেছনের নিচু জায়গায় কোনরকমে পৌঁছাই। ওখান থেকে বাংলোর রাস্তা আমার জানা আছে।'

galporchhabi.blogspot.in

বন্দী লোক দুটোকে পেছনে ফেলে আমরা কালীমুন্দির কথামতো পেছন দিকে মাথা নিচু করে বুকে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু ভাবা বা বলা যত সহজ, সত্যি সত্যি ঐভাবে বুকের ওপর ভর করে এগোনো খুবই কষ্টকর। পাথুরে কর্কশ কাঁটাগাছে ভরা জমির ওপর দিয়ে বুকে ভর করে এগোতে গিয়ে জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফট্টাফাই, হাত-পায়ের অনেক জায়গা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু তবু মাথা উঁচু করে হাঁটবার উপায় নেই। আমাদের কাছে এখন তিনটে রিভলভার। একটা কাকার, আর দুটো ওই লোক দুজনের। কিন্তু এগুলি এখন আমাদের বিশেষ কাজে লাগছে না। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় কোনরকমে বুক ঘষটে ঘষটে নিচের ঢালু জমিটায় পৌঁছলাম। জায়গাটা পাহাড়ী মালভূমির একপ্রান্তে। শাল, পিয়াল, বহড়া, অর্জুন গাছের সারি। নিচে তাকালে চোখে পড়ে পাহাড়ী উপত্যকার ভেতর দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। এখানে পৌঁছবার পর চারদিকের দৃশ্য দেখে মন জুড়িয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য বিপদের কথা ভুলে গেলাম।

ব্যাগ থেকে ম্যাপ বের করে নিজেদের অবস্থান হিসেব করে বের করল কাকা। 'বাংলো থেকে এই জায়গার দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। তাড়াতাড়ি হাঁটলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। চল বাদল, তাড়াতাড়ি কর। হাতে বেশি সময় নেই। দেরি হলে বিপদে পড়ে যেতে পারি।'

জিনিসপত্র গোছগাছ করে সবে বাংলোর রাস্তা ধরেছি, এমন সময় আচমকা একটা বিরাট জাল এসে পড়ল আমাদের ওপর। হুড়মুড় করে উলটে পড়ে গেলাম। ব্যাপারখানা কী ভালো করে বোঝবার আগেই দেখলাম, আমাদের ঘিরে ফেলেছে পাঁচ-ছ'জন লোক। ওদের মধ্যে একজন মনে হয় দলপতি। ওর হাতে পিস্তলের মতো কী একট জিনিস, কাঁধে বড়সড় ব্যাটারির মতো কী যেন ঝোলানো। জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম, ভালো করে কিছু দেখবার বা বোঝবার মতো মন ছিল না তখন।

দলপতি লোকটি ইংরেজিতে বলল, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের হাতে যে পিস্তলটা দেখছেন, এটা কোন সাধারণ পিস্তল নয়। এটা লেসার পিস্তল। এই পিস্তল দিয়ে আপনাদের পুড়িয়ে ছাই করতে আমার এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। দেখবেন?'

এইবার লোকটিকে চিনতে পারলাম। আরে এই লোকটিই তো সেই মিঃ ডেভিস। সারকিট হাউসে পরিচয় হয়েছিল। সঙ্গের সেই আজিজুর রহমান কোথায়? কাছে পিঠে কোথাও আছে নিশ্চয়ই।

ওদিকে মিঃ ডেভিস হাতের লেসার পিস্তল তাক করেছেন কাছের এক বুনো ঝোপের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে বুনো ঝোপ দপ করে জ্বলে উঠল। লেসার পিস্তলের ক্ষমতা দেখে বুকের ভেতরটা শিউরে উঠল। একদিকে লেসার পিস্তল হাতে নির্মম ডেভিস, আর একদিকে সূর্যকাকার হদিশ করতে এসে জালে ধরা-পড়া তিনজন অসহায় প্রাণী। ডেভিস যে আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে, তা মনে হয় না।

galpochhalabi.blogspot.in

এমন কি তেমন মর্জি হলে ওই লেসার পিস্তল দিয়েই আমাদের পুড়িয়ে মারতে পারে।

মুহূর্তের মধ্যে বুনো ঝোপ দপ্ করে জ্বলে উঠল (পৃঃ ৩৫)

ডেভিসের নির্দেশে একজন আমাদের ওপর থেকে জালটা সরিয়ে দিল। ওই লোকটিই আমাদের তিনজনের হাতে পরিয়ে দিল হ্যাণ্ডকাফ। আমাদের কাছে তিন

galpochhabi.blogspot.in

তিনটে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও পকেট থেকে ওগুলো বের করতেই পারলাম না। তাছাড়া বের করবই বা কী করে! ডেভিস তার আগুন পিস্তল সব সময় আমাদের দিকে উঁচিয়ে আছে।

ডেভিসের মুখে ব্যঙ্গের হাসি, 'তারপর মিঃ বোস, কী খবর? সেদিন বোমার হাত থেকে বেঁচে ভাবলেন, আপনাকে ধরে কে? আপনি বড্ড বোকা, না হলে সামান্য একটা রিভলভার নিয়ে আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এসেছেন! চলুন, এখন দিনকতক আমার হাজতে থাকবেন।'

কোন উত্তর দিল না কাকা, শুধু নীরবে একবার ডেভিস আর তার দলবলের ওপর নিজের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল।

ডেভিসের নির্দেশে জঙ্গলের পথ দিয়ে আমাদের চলা শুরু হলো। তবে বাংলোর দিকে নয়, উলটো দিকে, ডেভিসের আস্তানামুখী। একেবারে সামনে ডেভিস নিজে, তারপর আমরা তিনজন, আমাদের পেছনে ডেভিসের পাঁচজন লোক। মালভূমির প্রান্ত ধরে উঁচু-নিচু পথ দিয়ে আমরা হাঁটছি তো হাঁটছি। দু পাশে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু সে-সব দেখার মতো মন নেই। ডেভিস যে রকম নির্মম প্রকৃতির, ও যে আমাদের নিয়ে কী করবে কে জানে! দূরে গাছের ডালে একটা পাখি বিকট শব্দে ডেকে উঠল। সেই বিকট শব্দে মনের ভেতরটা আতঙ্কে ভয়ে কুঁকড়ে এলো। বাবা-মা-বোনের কথা ভেবে চোখে জল ভরে এলো।

একটু পরে ডেভিসের দেখাদেখি আমরাও থেমে গেলাম। সামনে দেখি একটা উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড় ফুঁড়ে গুহার মতো রাস্তা।

ডেভিস হাঁক দিল, 'রুবেন, এদের তিনজনের চোখ বেঁধে দাও তো!'

ডেভিসের মুখে রুবেনের নাম শুনে চমকে উঠলাম। আরে এই রুবেনের কথাই তো শুনেছিলাম শিরীষ পালের মুখে। তাহলে এই লোকটিই রুবেন সিংহ। শিলংয়ে বাড়ি। এ তাহলে ডেভিসের দলে ভিড়েছে! কী উদ্দেশ্যে! নিশ্চয়ই কেবলমাত্র ডঃ সূর্য চ্যাটার্জীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ডেভিসের দলে যোগ দেয়নি। অন্য কোন গোপন কারণ নিশ্চয়ই আছে।

রুবেন আমাদের তিনজনের চোখ বেঁধে দিল। এক বিশেষ ধরনের রুমাল দিয়ে এমনভাবে চোখ বাঁধল যে রুমালের ভেতর দিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। অবশ্য দেখতে পেলেই বা এমন কি সুবিধে হতো। এমন এক দলের হাতে ধরা পড়েছি, যাদের হাত থেকে বেঁচে ফিরতে পারব কিনা কে জানে! এখন একমাত্র ভরসা শিরীষ পাল। আজ না হোক, কাল কালীপদর কাছ থেকে খবর পাবে। তারপর নিশ্চয়ই নিজের বিরাট পুলিস বাহিনী নিয়ে সমস্ত জায়গাটা ঘিরে ধরবে।

ডেভিসের নির্দেশে চোখবাঁধা অবস্থায় আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ওদের একজনের হাত ধরে হাঁটছি তো হাঁটছিই। মনে হলো, কিছুক্ষণ যেন একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটলাম, তারপর এসে দাঁড়ালাম খোলা সমতল জায়গায়। সেখানে কিছুক্ষণ

galpercomics.blogspot.in

দাঁড়িয়ে থাকবার পর আবার পথচলা। এবার আর সমতলে নয়। এবার সিঁড়ি বেয়ে শুধু নিচে নেমে যাওয়া। নামছি তো নামছিই। সিঁড়িগুলো গুনছিলাম। প্রায় পাঁচশো সিঁড়ি নামতে হলো। তারপর যেন ঢুকলাম একটা বাড়ির ভেতরে। সেই বাড়ির ভেতরে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো আমাদের। ঠং করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কে যেন বলল, 'এবার আপনারা নিজেদের চোখ খুলে ফেলতে পারেন।'

নির্দেশমতো আমরা তিনজনে যে যার চোখ খুলে ফেললাম। দেখলাম একটা ছোট ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। ঘরটার মাপ আট ফিট বাই আট ফিট। একটা তক্তপোশ, গোটা দুয়েক চেয়ার, একটা টেবিল। টেবিলের ওপর একটা কুঁজো। জল খাওয়ার জন্য একটা গ্লাস। ঘরের একটাই মাত্র দরজা। লোহার জালি দেওয়া দরজা, তাতে বাইরে থেকে তালা দেওয়া। সবকিছু দেখেশুনে আর কোন সন্দেহ রইল না, ডেভিসের হাতে আমরা তিনজনে এখন বন্দী।

কাকা অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কাকা কী ভাবছে! এখান থেকে কী করে পালানো যায়, সে-সব কথা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে। অন্তত তাই তো করা উচিত। কিন্তু ওর মুখ আশ্চর্য নির্বিকার নির্লিপ্ত। অথচ আমি দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি। এখান থেকে কোনদিন বেরোতে পারব কিনা কে জানে! নাকি ডেভিসের ঐ লেসার পিস্তলেই জীবন দিতে হবে।

এতক্ষণে সৃজনকাকা মুখ খুলল, 'কিরে বাদল! খুব ঘাবড়ে গেছিস, নারে?'

কাকার প্রশ্নে আমার খুব রাগ আর অভিমান হলো। এটা আবার একটা প্রশ্ন। তবে কি ডেভিসের মতো একজন ভয়ংকর লোকের হাতে বন্দী হয়ে আনন্দ করব?

কালীমুদ্দির দিকে তাকিয়ে দেখি, তক্তপোশের ওপর চুপচাপ বসে। মনে হয় কিছু প্ল্যান ভাঁজছে মনে মনে।

কাকা বলল, 'কিছু ঘাবড়াবার নেই। আমাদের ফিরতে দেরি হলেই শিরীষ পালের কাছে খবর পৌঁছে দেবে কালীপদ। তারপর পুলিসের দলবল নিয়ে শিরীষ পালের এখানে পৌঁছাতে আর কতক্ষণ?'

'কিন্তু শিরীষ পাল কী করে আমাদের এই জায়গাটার খোঁজ পাবে? আমাদেরই তো এখানে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে।'

আমার কথায় মুচকি হাসল সৃজনকাকা, 'আরে ডেভিস তো কেবল আমাদের চোখ বেঁধেছিল, কিন্তু আমাদের মনকে তো বাঁধতে পারেনি। চোখ বাঁধবার পর আমরা কোনদিকে কত পা এসেছি, তা অবিকল গুনে রেখেছি।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু শিরীষ পাল কী করে তা জানতে পারবে? আমরা কোথায় বন্দী হয়ে আছি, সে-কথা তো কালীপদ জানে না।'

এবার সৃজনকাকার মুখে রহস্যময় হাসি, আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস গলায় বলল, 'আমার কোমরে বাঁধা আছে একটা ওয়াকি টকি। সময়মতো এখান

galporchhabi.blogspot.in

থেকেই খবর পাঠাতে পারব শিরীষ পালকে। চুপ, এ নিয়ে আর কোন কথা বলিস না। ওরা টের পেলে মুশকিল।'

কাকার কথা শুনে আমার চোখ গোল। ওয়াকি টকি আবার কোথা থেকে যোগাড় করল! আশ্চর্য, আমাকেও কিছু বলেনি আগে! তবু মনে মনে তারিফ জানাই কাকাকে। ওয়াকি টকি আছে যখন সঙ্গে, তখন চিন্তার তেমন কারণ নেই বোধহয়। ওয়াকি টকি যন্ত্রটা রেডিও ট্রানসমিটারের মতো, বিনা তারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পাঠানো যায়। তবে বলা যায় না, ডেভিস লোকটা যেমন চালাক আর নির্মম, হয়তো এখান থেকে কোন খবর পাঠাবার আগেই আমাদের শেষ করে দিতে পারে ঐ আগুন পিস্তল দিয়ে কিংবা সার্চ করে ওয়াকি টকি যন্ত্রটাকে নিয়ে নিতে পারে।

কাকা কালীমুদ্দি আর আমাকে কাছে ডাকল, তারপর বলল ফিসফিস করে, 'এখানে খুব সাবধানে থাকতে হবে। প্রত্যেকটা কাজ করতে হবে অনেক ভেবেচিন্তে।'

কাকা নিজের হ্যাভারস্যাক থেকে ম্যাপটা বের করল। মেঝের ওপর সেটাকে বসিয়ে কী সব মাপজোক করল, তারপর বলল, 'দেখ বাদল, আমরা বোধহয় এই ছোট পাহাড়টার মাথায় আছি।'

'পাহাড়ের মাথায় না তলায়! এখানে ঢুকবার আগে আমার তো মনে হচ্ছিল, আমরা কেবল নামছি তো নামছি।'

'ঠিক বলেছিস। মনে হচ্ছে এই বাড়িটা তৈরি করেছে পাহাড়ের ভেতরে। অনেকটা দুর্গের মতো। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই।'

॥ আট ॥

'গুড ইভনিং মিঃ বোস। তারপর কেমন আছেন? পালাবার রাস্তা খোঁজ করছেন? করুন, করে যান। কোন আপত্তি নেই—' ডেভিস দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

ডেভিসের কথা শুনে আমি তো অবাক। কী করে দেখল? কখন দেখল?

'এই ঘরে টি ভি ক্যামেরা বসানো। আমি সব দেখতে পাচ্ছি। বুঝলেন মিঃ বোস! তবে এরকম কষ্ট আপনাদের একেবারেই সহ্য করতে হবে না, যদি আমার কথামতো চলেন।'

ডেভিস থামল। দৃষ্টি কাকার মুখে। কিন্তু কাকা নীরব, কোন কথা বলছে না।

'যদি আমার কথামতো চলেন, তবে অনেক টাকা পাবেন। অনেক টাকা। আপনাদের ডঃ সূর্য চ্যাটার্জী তো সব মেনে নিয়েছেন। উনি আমাদের নির্দেশমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আপনি ওঁরই জন্য—'

galporchhabi.blogspot.in

'মিথ্যে কথা'—চাপা গলায় গর্জে উঠল কাকা, 'হতেই পারে না।'

'তাই নাকি। বিশ্বাস হচ্ছে না। ঠিক আছে, কাল আপনাকে দেখাব। নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস হবে তো।' ডেভিসের মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

'ডঃ চ্যাটার্জী আমার প্রিয় বন্ধু। তাকে খুব ভালো করেই জানি। তাকে হয়তো জোর করে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবেন না।'

'ও, তাই নাকি! খুব যে বন্ধুপ্রেম। তবে আসুন, দেখবেন আসুন। এক্ষুণি দেখাচ্ছি আপনাকে। তবে আপনি একলা—'

'আমার ভাইপোকে সঙ্গে নিতে দিন। আপনার কোন ভয় নেই।'

'ভয়! আপনি হাসালেন। আমি ভয় পাব এই পুঁচকে ছোঁড়াটাকে। ঠিক আছে। ও চলুক আমাদের সঙ্গে। তবে ওই লোকটি ভেতরেই থাকবে—'

ডেভিসের সঙ্গে আমি আর কাকা ঘরের বাইরে বেরোলাম। সঙ্গে রুবেন আর আজিজুর। আমরা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজায় আবার তালা লাগিয়ে দিল আজিজুর।

আজ যখন ডেভিস আমাদের ধরে নিয়ে এসেছিল, তখন ছিল আমাদের চোখ বাঁধা। কিন্তু এখন চোখ খোলা অবস্থায় ভেতরটা পুরো দেখতে পাচ্ছি। ঘর থেকে বেরিয়েই একটা লাউঞ্জ। পুরোপুরি বৃত্তাকার। কালো চকচকে মেঝে। একপাশে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি ও লিফট, কিন্তু নিচে নামবার কোন সিঁড়ি নেই। অর্থাৎ মনে হয়, বাড়িটার সবচেয়ে নিচের তলায় আমরা আছি। লাউঞ্জে কোন জানলা নেই, বাইরের আলো নেই, তাই সময় বোঝবার কোন উপায় নেই। কাকার ঘড়ি থেকে সময় হিসেব করে বুঝলাম, এখন রাত আটটা।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, গোলাকার লাউঞ্জের চারপাশে অনেকগুলি ঘর। সব কটা ঘরের দরজা ভেজানো। এইসব ঘরগুলির ভেতরে কী হয় কে জানে!

ডেভিসের নির্দেশমতো ওর পেছন পেছন লিফটে গিয়ে উঠলাম। ছোট লিফট, কিন্তু খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো। সুইচ টিপলে লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল। খুব সম্ভবত পাঁচ তলায় আমাদের লিফট দাঁড়িয়ে পড়ল।

লিফট থেকে বেরিয়ে দেখি, একতলার মতোই গোলাকার লাউঞ্জ। লাউঞ্জ ঘিরে এখানেও অনেকগুলি ঘর, তবে ঘরের সংখ্যা একতলার চেয়ে কম। তাছাড়া সূর্যের আলো আসবার জন্য অনেকগুলো লম্বাটে কাচের জানলা রয়েছে। তবে সব ক'টা জানলাই বন্ধ। এখন রাত্তির, তাই বাইরের কোন আলো নেই।

আমরা পাঁচজনে নীরবেই হাঁটছিলাম। আমি আর কাকা দুজনেই দু'চোখ মেলে সব কিছু দেখছিলাম। উদ্দেশ্য একটাই, যদি পালাবার কোন পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

ডেভিস বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, তাই ব্যঙ্গের স্বরে

galpochhabi.blogspot.in

বলল, 'মিঃ বোস বোধহয় পালাবার রাস্তা খুঁজছেন। কিন্তু ভুলে যাবেন না, এ বাড়ির প্রত্যেকটা দরজা জানলায় ইলেকট্রনিক ডিভাইস লাগানো আছে। পালাবার চেষ্টা করলেই সে খবর পোঁছে যাবে আমার কনট্রোল রুমে টি ভির পর্দায়। পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে আর কোন ক্ষমা নেই। শুধু একটাই শাস্তি। মৃত্যু— হাঃ হাঃ করে পাগলের মতো হাসতে লাগল ডেভিস। কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে।

ডেভিসের পেছন পেছন একটা ঘরে ঢুকলাম আমরা। কিন্তু রুবেন আর আজিজুর ভেতরে ঢুকল না। বোধহয় বাইরে পাহারা দেবে। নাকি অন্য কোন কাজে গেল।

ডেভিসের সঙ্গে ঘরে ঢুকে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। এত নানা ধরনের যন্ত্রপাতি যে অবাক না হয়ে পারা যায় না। মনে হলো, এইটিই বোধহয় ডেভিসের সেই কনট্রোল রুম। কাকার কাছে কম্পিউটারের বইতে অনেকগুলো ছবি দেখেছিলাম, ডেভিসের এই কনট্রোল রুমের সঙ্গে সেই ছবিগুলোর দারুণ মিল। একপাশে গোটা ছয়েক টি ভি'র পরদা। তার ওপরে নিচে অসংখ্য সুইচ। একটা টেবিলের ওপর তিন চারটে টেলিফোন। নানা রংয়ের।

'এই যে দেখুন আমার কনট্রোল রুম,' বলতে বলতে ডেভিসের মুখে চাপা গর্বের হাসি ফুটে ওঠে।

'ছটা ক্লোজ সারকিট টি ভি'র চোখ দিয়ে সারা বাড়ির ওপর নজর রাখছি। আপনার বন্ধুটিকে দেখতে চান? দেখাচ্ছি, একটু অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন। কফি খাবেন? তাই খান বরং আপাতত।'

ডেভিস একটা সুইচ টিপে কী যেন বলল। মিনিট তিন চারের মধ্যে কফি এসে গেল। আমরা চুপচাপ কফি খেলাম। ডেভিস কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে খুটখাট কী সব করল। মাইক্রোফোনে কাকে যেন কী নির্দেশ দিল।

'মিঃ বোস, এবার এদিকে আসুন। তিন নম্বর টি ভি'র পরদায় চোখ রাখুন। দেখতে পাবেন আপনার বন্ধুকে—'

ডেভিসের কথামতো আমরা তাকালাম তিন নম্বর টি ভি'র পরদায়। অবাক হয়ে দেখলাম, সূর্যকাকা আমাদের দিকে পেছন ফিরে মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসে আছেন। পেছন ফিরে বসে থাকলেও মাঝে মাঝে ঘাড় ঘোরাচ্ছিলেন। তখন বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না যে ইনিই আমাদের সূর্যকাকা। তবে যেন বেশ ক্লান্ত।

আমি চেঁচিয়ে সূর্যকাকাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই খেয়াল হলো, আমরা তো সূর্যকাকাকে দেখছি না, দেখছি ওর ছবি। সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জা পেলাম মনে মনে।

কাকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাকা চুপচাপ এক মনে তাকিয়ে আছে টি ভি'র পরদায়। কাকার চোখ-মুখ দেখে মনের ভাব অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। মনে

galporchhabi.blogspot.in

হলো যেন কাকার চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু অনেক কষ্টে তা আটকে রেখেছে কাকা। এত কাছে, অথচ এত দূরে।

সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে ডেভিস। ওর একটা হাত পকেটে। আমাদের একটু বেচাল দেখলে মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে হয়তো বেরিয়ে আসবে লেসার পিস্তল। লেসার পিস্তলের অগ্নিশিখা আমাদের দগ্ধ করে ফেলবে নিমেষে। তাই সব কিছু জেনে বুঝেও আমরা নিরুপায়। এই মুহূর্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

তিন নম্বর টি ভি'র সুইচ অফ করে দিল ডেভিস।

'তাহলে মিঃ বোস, এবার বিশ্বাস হলো তো ডঃ চ্যাটার্জী আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন! তাই আপনাকে বলি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার কাজটা আপনি ছেড়ে দিন। তাতে আপনারই লাভ। এজন্য বেশ কিছু টাকা দেব আপনাকে। তাছাড়া বিবেকের দিক থেকেও আপনি মুক্ত, কারণ ডঃ চ্যাটার্জী আমাদের সঙ্গে নিজের ইচ্ছেয় সহযোগিতা করছেন। এক বছরের কনট্রাক্ট। কাজ শেষ হলেই উনি ফিরে যেতে পারবেন নিজের জায়গায়। কি বলেন—রাজী?'

ডেভিসের কথায় বেশ চিন্তিত মনে হলো কাকাকে।

ঘরের চারদিকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বলল কাকা, 'মিঃ ডেভিস, আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে তার আগে ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমি একবার আলোচনা করতে চাই। যদি বুঝি, ডঃ চ্যাটার্জী নিজের ইচ্ছেয় আপনাদের সঙ্গে কাজ করছেন, তবে আমি অন্তত চলে যাব। আপনার কাজে বাধার সৃষ্টি করব না। আশা করি, আপনি আমার যুক্তিটা বুঝতে পেরেছেন!'

কাকার কথা শুনে কেমন যেন গুম মেরে গেল ডেভিস। কিন্তু তা কেবল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই ঝলসে উঠল ডেভিসের চোখ-মুখ, 'কেন, টিভিতে আপনার বন্ধুকে দেখেও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাস করবার কথা নয়। বন্ধুর খোঁজে এতদূর এসেও ওর সঙ্গে দেখা না করে কথা না বলে চলে যাব, সেটা কেমন কথা! তাছাড়া কলকাতায় ফিরে ওর স্ত্রীকেই বা কী বলব? আচ্ছা, ওর স্ত্রীকে তো আপনারা চিঠি দিলেই পারতেন। তাহলে উনিও এতটা অধীর হয়ে পড়তেন না আর আমাকেও হয়তো এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হতো না।'

'হ্যাঁ, সেকথা আমরা ভেবেছি। ডঃ চ্যাটার্জী শিগগিরই ও'র স্ত্রীকে চিঠি দেবেন। আপনিই বরং ফিরে গিয়ে ও'র স্ত্রীকে খবরটা দিয়ে দেবেন।'

কাকার মুখে ব্যঙ্গের হাসি, 'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে না! আমি এখান থেকে ফিরে যাব অথচ সূর্যর সঙ্গে দেখা হবে না!'

কাকার কথায় ডেভিসের মুখ অসম্ভব গম্ভীর, 'দেখুন মিঃ বোস, ডঃ চ্যাটার্জী

galporchhabi.blogspot.in

এখন অত্যন্ত জরুরি গবেষণায় ব্যস্ত, ওঁর সঙ্গে এখন দেখা করানো সম্ভব নয়। আপনার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো মানসিক দিক থেকে বিব্রত হয়ে পড়বেন।'

এরপর কাকা আর কোন কথা বাড়াল না। চুপচাপ ঘরের সবকিছু দেখতে লাগল। তিন নম্বর টি ভি'র পর্দা আপাতত বন্ধ। কিন্তু দু' নম্বর আর চার নম্বর টি ভি'র পর্দা এখন সক্রিয়। ওতে নানারকম ডিজাইন ফুটে উঠছে। অদ্ভুত নানা ধরনের ডিজাইন, সঙ্গে কিছু কিছু জটিল অংকের ফরমূলা।

টি ভি'র পর্দায় নানা রকম জটিল অংক দেখতে দেখতে বলল কাকা, 'মিঃ ডেভিস, একটা কথা। যদিও আমি আপনার বিরুদ্ধ পক্ষের লোক, তবু এত কাজকর্ম দেখে আপনাকে প্রশংসা না করে পারছি না। যদি আপত্তি না থাকে, তবে কি একটু খুলে বলবেন, আপনি কি করতে চাইছেন এখানে।'

কাকার কথায় গর্বের হাসি ডেভিসের মুখে।

'দেখুন মিঃ বোস, আমি যা করছি, তা সবই অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। সবকিছু খুলে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু একটা কথা বলি, আমি যে গবেষণা হাতে নিয়েছি, তা সফল হলে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ হবে। ইউরেনিয়ামের নতুন আইসোটোপ আবিষ্কার করেছি। তবে কাজকর্ম কিছু বাকি আছে এখনো।'

'ইউরেনিয়ামের নতুন আইসোটোপ!' কাকার গলার স্বরে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনারা জানেন ইউরেনিয়ামের তিনটে আইসোটোপ। আমার ল্যাবরেটরিতে চার নম্বর আইসোটোপ আলাদা করেছি।'

আমার মনে পড়ে গেল, কাকা বুঝিয়েছিল, ইউরেনিয়ামের তিনটে আইসোটোপ অর্থাৎ রাসায়নিক দিক থেকে সব ইউরেনিয়াম এক হলেও, পরমাণুর ভেতরে নিউট্রনের সংখ্যা সমান নয়। পারমাণবিক গুরুত্বও সমান নয়। আমাদের জানা ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ হলো ইউ ২৩৮, ইউ ২৩৫ আর ইউ ২৩৪। এর মধ্যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে লাগে ইউ ২৩৫। কিন্তু প্রকৃতিতে ইউ ২৩৫ খুব কম পাওয়া যায়, যদিও ইউ ২৩৮ যথেষ্টই আছে।

ডেভিস আরো বলে যায়, 'আপনি ভূতাত্ত্বিক হিসেবে নিশ্চয়ই জানেন, প্রকৃতিতে যত ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগই হলো ইউ ২৩৮। অবশ্য পারমাণবিক রিয়াকটরে বোমবার্ডমেন্ট করে ইউ ২৩৮ থেকে ইউ ২৩৫ বানানো সম্ভব হচ্ছে এখন। কিন্তু আমি চাইছিলাম আরো শক্তিশালী জোরদার কোন আইসোটোপ। গত দশ বছর যাবৎ গবেষণা চালাচ্ছি, যদি তেমন কোন আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়। আপনি জেনে অবাক হবেন ইউ ২৩৮ থেকে ইউ ২৩৩ তৈরি করতে পেরেছি আর এর ক্ষমতা ইউ ২৩৫-এর চেয়ে অনেক বেশি। তবে এখনো বেশ কিছু কাজ বাকি আছে। আমার এই গবেষণা যদি সফল হয়, তবে—ও গড—আমিই হবো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক—' কথা বলতে বলতে প্রায় পাগলের মতো হাসতে লাগল ডেভিস।

galporchhilabiblogspot.in

ওর হাসির শব্দে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা বরফ-ঠাণ্ডা স্রোত নামতে থাকে। একটু আগে ডেভিস যখন কথা বলছিল, তখন ওকে মনে হচ্ছিল কত বড় বৈজ্ঞানিক, ওর ওপর বেশ শ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু এখন ওর হাসিতে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব উবে গেল, ফুটে উঠল এক শক্তিমদমত্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তির ছবি।

কাকার দিকে তাকিয়ে দেখি, ভাবলেশহীন মুখে কাকা দাঁড়িয়ে, হয়তো বা খানিকটা অবিশ্বাস মেশানো ওর মুখে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ডেভিসের। এই দানব বৈজ্ঞানিক —হ্যাঁ, এই নাম ছাড়া অন্য কোনভাবে ভাবতে পারছি না ডেভিসকে—এই দানব বৈজ্ঞানিক অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে ইউ ২৩৩ সম্পর্কে।

'মিঃ বোস, আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে। যদি আমার এই গবেষণা সফল হয়, তবে সারা পৃথিবীর চেহারাই আমরা বদলে দেব। ভাবতে পারেন সেই অনাগত দিনের কথা, যেদিন আমাদের হাতেই থাকবে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। আপনিও আমার দলে যোগ দিন মিঃ বোস।'

ডেভিসের কথায় আমরা অবাক। এটা আবার কোন চাল কে জানে!

'কিন্তু আমি আপনার এখানে কী কাজ করব? আমি তো একজন সাধারণ ভূতাত্ত্বিক, আণবিক বিজ্ঞানী নই। আপনার কথা শুনে যা বুঝতে পারছি, তাতে মনে হয় আপনার হয়তো প্রয়োজন একজন পদার্থবিদের। ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আপনি পারেন, নিশ্চয়ই পারেন। মানুষ ইচ্ছে করলে কী না করতে পারে! আপনি আমার কথাই ধরুন। আমি ছিলাম একজন অতি সাধারণ প্রযুক্তিবিদ বা বলতে পারেন মেকানিক। কাজ করতাম আমেরিকার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ল্যাবরেটরিতে। সেখানে কাজ করতে করতেই সবকিছু শিখেছি আমি। একজন সাধারণ মেকানিক থেকে আজ আমি পদার্থবিদ।

ইউরেনিয়ামের নতুন এই আইসোটোপ আবিষ্কার সফল হলে হয়তো নোবেল পুরস্কারই পেয়ে যাব। তাই বলছি, নিজের সম্বন্ধে কখনো নিচু ধারণা রাখবেন না। আর তাছাড়া আপনাকে আমি কাজে লাগাব মূলত আকরিক বাছাইয়ের ব্যাপারে। আপনি ভূতাত্ত্বিক, আমি জানি, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

ডেভিসের কথা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল কাকা, তারপর বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। আপনার ল্যাবরেটরিতে কারা কাজ করেন? আপনি একা নাকি আরো অনেকে আছেন?'

'না না, আমি একলা কি এত বড় গবেষণা চালাতে পারি? আমার মূল গবেষণাগারে আমি ছাড়া আরো দুজন কাজ করছেন। ওঁরা দুজনেই ভারতীয়, তবে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন। ওদের ফেলোশিপ শেষ হয়ে যাওয়ায় আমার এখানে কাজ করছেন।'

galporchhobi.blogspot.in

'আশ্চর্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে এখানে—'

'কেন, এতে অবাক হবার কী আছে! কাজ করাটাই আসল, কোথায় করছি, সেটা নিশ্চয়ই ততটা জরুরি নয়। তাছাড়া ওদের দুজনকে এত টাকা দিচ্ছি যে টাকা পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই দেবে না। মিঃ বোস, আপনিও আমার সঙ্গে যোগ দিন, আপনাকেও অনেক টাকা দেব।'

॥ নয় ॥

আমি জানতাম, কাকা কখনোই ডেভিসের কথায় মত দেবে না। কিন্তু আমি নিজেই চমকে উঠলাম কাকার কথায়, 'মিঃ ডেভিস, আপনি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই যখন কাজ চালাচ্ছেন তখন নীতিগতভাবে আপনার প্রস্তাব মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কাজের ব্যাপারে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা থাকবে!'

'কনগ্র্যাচুলেশনস্. হাত মেলান মিঃ বোস। আপনি তাহলে আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করুন, কি বলেন?'

'ঠিক আছে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আজ আমাদের ছেড়ে দিন, একদিনের জন্য পুরুলিয়া ঘুরে আসি। আবার কালই আপনার এখানে জয়েন করব। তাছাড়া আমার ভাইপোকে তো কলকাতা পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

'সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আমার লোক গিয়ে আপনার ভাইপোকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু আপনার এখান থেকে যাওয়া চলবে না। বুঝতেই তো পারছেন আমাদের কাজটা একটু অন্য ধরনের। এ ব্যাপারে আমাদের গোপনীয়তা রাখতেই হবে। সুতরাং—'

'সুতরাং আমিও আপনার এখানে বন্দী। সে আপনি আমাকে সম্মান দেখিয়ে যতই কর্মরত বিজ্ঞানী বলুন না কেন—'

কাকার কথায় ডেভিসের মুখ গম্ভীর।

'সে আপনার ইচ্ছে। আপনাকে দিন দু'য়েক সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে আপনি ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে মতামত দেবেন।' ডেভিসের গলার স্বর কর্কশ।

দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা সুইচ টিপল ডেভিস। একটু পরেই দরজা ঠেলে ঢুকল দু'জন লোক। উর্দি পরা, উর্দির পকেটে নীল সুতো দিয়ে সেলাই করা ইউ ২৩৩।

রেগে-মেগে লোক দু'টিকে হিন্দিতে নির্দেশ দিল ডেভিস, 'এদের ৫০৩ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।'

কণ্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে লিফটে চেপে নিচের তলায় নামলাম দু'জন পাহারাদার সঙ্গে। ৫০৩ নম্বর ঘরটা খুব সুন্দর সাজানো। দুটো সিংগল খাট, একটা টুইন আলমারি, দুটো টেবিল, দুটো চেয়ার। সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম।

ওদের একজন বলল, 'আপলোক ইধার রহিয়ে—'

galpokolpo.blogspot.in

কাকা বলল, 'লেকিন হমলোগকো সাথ আউর এক আদমী থা—'

'আপ ফিকির মত কিজিয়ে। উনকে লিয়ে ভি দুসরে কুছ ইন্তেজাম হোংগে।'

লোক দুটো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো একটু পরেই। ওর হাতে কাকার সেই হ্যাভারস্যাক। ওটা ঝুপ করে টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে থেকে ঘরে তালা লাগাবার শব্দ পেলাম।

কাকা বলল, 'আমরা তাহলে আবার ডেভিসের হাতে বন্দী।'

এই ঘরে একটাই জানলা, তাতে পুরু পর্দা ঝুলছে। পর্দা সরিয়ে দেখা গেল, জানলায় শক্ত লোহার গ্রিল। পালাবার কোন রাস্তা নেই। কেবল একমাত্র ভরসা, কাকার কোমরে বাঁধা ওয়াকি-টকি যন্ত্রটা। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল, বাইরে রাত নেমে এসেছে। দূরে পাহাড়, জঙ্গল সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ।

কাকা ঘড়ি দেখল। রাত ন'টা।

বাইরের দরজার তালা খোলার শব্দ পেলাম।

কাকা বলল, 'ঐ যে বোধহয় রাতের খাবার নিয়ে এসেছে।'

এই ঘরের মধ্যে বন্দী অবস্থায় দিন পাঁচেক কাটলো এভাবে। রোজ তিন বেলা খাবার আসত। খেতাম, ঘুমোতাম, আর নানা প্ল্যান আঁটতাম মনে মনে, কী করে পালানো যায় এখান থেকে। মাঝে মাঝে ভাবতাম, কাকাকে জিজ্ঞেস করব সেই স্লিপ প্যাডে ছাপা নম্বরের রহস্য। কিন্তু কাকার মুখ দেখে সাহস হতো না।

* * * *

হঠাৎ একদিন ভোরে ঘুম ভেঙে গেল বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন দেখে। ধড়মড় করে উঠে দেখি আমি আর কাকা ঘরেই শুয়ে আছি।

কাকা তখনো ঘুমোচ্ছে। একবার ভাবলাম, কাকাকে ডাকি। পরে মনে হলো, যাকগে, অনেক দুশ্চিন্তা যাচ্ছে কাকার, যদি একটু ঘুমোয় তো ঘুমোক না।

আমার বিছানার পাশে জানলা। সেই জানলার পুরু পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাতেই আবার সেই মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

রোজকার মতো আজও চোখে পড়ল, চারদিকে ঘেরা উঁচু পাহাড়ে শাল সেগুনের জঙ্গল। তারই মাঝখানে গোল নিচু উপত্যকায় ডেভিসের এই বাড়ি বা আস্তানা। ঘরের জানলা দিয়ে নিচে তাকালে মনে হয়, বাড়িটা বোধহয় পাঁচ-ছ'তলা। তবে আরো উঁচুও হতে পারে, কিংবা মাটির নিচে আরো কতগুলি তলা থাকতে পারে। গোল প্রান্তরের মাঝখানে যেটা দেখে আজ সবচেয়ে অবাক হই, সেটা হলুদ রংয়ের কী একটা গাড়ি। এত দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে গাড়িটার আকার গোল, চ্যাপ্টা। একে ঠিক মোটর গাড়ি বলা যাবে না, অথচ যেন এরোপ্লেনও নয়। এটা আমার কাছে রহস্যই থেকে যায়। হলুদ রংয়ের গাড়িটা প্রান্তরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন তো এটা দেখিনি, আজ এলো কোত্থেকে!

galpopathabi.blogspot.in

কাকাকে ধাক্কা দিয়ে ওঠালাম, ‘কাকা, দেখ কি অদ্ভুত ধরনের একটা গাড়ি।’

চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল কাকা, ‘কই, কী ব্যাপার—’

জানলার কাছে কাকাকে টেনে নিয়ে সেই হলুদ রংয়ের গাড়িটা দেখালাম কাকাকে। কাকা অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে গাড়িটাকে দেখে একটু চিন্তিত গলায় বলল, ‘সঙ্গে বাইনোকুলারটা আছে বোধহয়, ওটা নিয়ে আয় তো।’

বাইনোকুলারের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, কাকার কথায় ছুটে গিয়ে হ্যাভারস্যাকের ভেতর থেকে বের করলাম আমার প্রিয় বাইনোকুলার। এই বাইনোকুলার দিয়েই সেবার আন্দামানের সমুদ্রে আবিষ্কার করেছিলাম পাপিয়া-বাদল দ্বীপ। অবাক কান্ড, এটাকে সরায়নি ডেভিসের লোকজন।

কাকার হাতে না দিয়ে আমি নিজেই বাইনোকুলারের ভিতর দিয়ে তাকালাম নিচের দিকে। একটু পরেই আমার মুখ দিয়ে যে কথাটা বেরিয়ে এলো, তাতে আমি নিজেই অবাক।

‘ফ্লাইং সসার—’

ঠিক এইরকম ফ্লাইং সসারের একটা ছবি দেখেছিলাম জুনিয়র এনসাইক্লোপেডিয়ার পাতায়।

কাকা আমার হাত থেকে বাইনোকুলার কেড়ে নিয়ে একমনে দেখতে লাগল ফ্লাইং সসারটা।

দেখতে দেখতে কাকা বলল, ‘ডেভিসের জাল দেখছি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো। মনে হচ্ছে এটাকেই আকাশে দেখেছিল কালীমুদ্দি।’ চাবি দিয়ে দরজা খোলার শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে জানলায় পর্দা ফেলে ভালো ছেলের মতো বিছানায় বসে পড়লাম।

উর্দি-পরা রক্ষী। হাতে সকালের ব্রেকফাস্ট। কোন কথাবার্তা না বলে ব্রেকফাস্টের ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল! লক্ষ করলাম, এবার আর দরজায় তালা লাগাল না। অবশ্য দরজা খোলা থাকলেই বা কি! এ বাড়ির পুরো নকশা না জেনে এখান থেকে পালানো প্রায় দুঃসাধ্য। ভালো মতো প্ল্যান না করে পালাতে গেলে আগুন পিস্তলে মরতে হবে নির্ঘাৎ।

একটু পরেই আবার ফিরে এলো সেই রক্ষী। ওর হাতে এক প্যাকেট চুরুট, কাকার প্রিয় জিনিস। সঙ্গে একটা দেশলাই। বাঃ, ডেভিস তো বেশ আতিথেয়তা করছে।

চুরুট আর দেশলাই দেখে এই বন্দীদশার মধ্যেও হাসি পেল। তবু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়, ডেভিস লোকটার নজর এবং রুচি আছে। একটা চুরুট ধরিয়ে কাকার বিরস ভাবটা দূর হলো।

লোকটা আবার বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল।

আজও ব্রেকফাস্ট ভালোই। একজনের জন্য চার পিস করে মাখন মাখানো টোস্ট, দুটো ডিমের পোচ আর কলা। কাল রাতে ভালো করে খেতে পারিনি, তাই বেশ খিদে

galpokatha.blogspot.in

পেয়েছিল। আয়েশ করে ব্রেকফাস্ট সারলাম, যদিও মনের মধ্যে সব সময় চিন্তা, কী করে ডেভিসের খপ্পর থেকে পালানো যায়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি জানলার ধারে। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে লক্ষ রাখছি হলুদ রংয়ের ফ্লাইং সসারের ওপর। এটি কংক্রিটে বাঁধানো গোল চত্বরের ওপর দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ ভালো করে নজর করবার পর বুঝতে পারলাম, দূর থেকে গোলাকার মনে হলেও আসলে এর আকার খানিকটা ইলিপটিক্যাল বা উপবৃত্তীয়। সামনের দিকে পাইলটের বসবার জায়গা, তাছাড়া চ্যাপ্টা ধারের দিকে অনেকগুলো জানলা। ক্রমে বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদের তেজ বাড়ছে। ফলে আশপাশের সবকিছু আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। ফ্লাইং সসার ছাড়াও মাঝে মাঝে আমার নজর কাড়ছিল চারিপাশের গোলাকার পাহাড়। প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। না হলে একটা ছোট গোল উপত্যকাকে ঘিরে কীভাবে এমন সুন্দরভাবে পাহাড়গুলি গড়ে উঠল, ভেবে অবাক হতে হয়। হঠাৎ মনে হয়, যেন প্রকৃতি নয়, কোন এক মহান স্থপতি এই পাহাড় উপত্যকা সৃষ্টি করেছে। পাহাড়, বন, উপত্যকার সৌন্দর্যে মশগুল হয়ে ছিলাম, এমন সময় নজরে পড়ল কারা যেন ফ্লাইং সসারের দিকে এগোচ্ছে। ওরা কারা? ডেভিস ও তার দলবল নয় তো!

সঙ্গে সঙ্গে ডাকলাম কাকাকে।

আমার ডাকে কাকা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে, 'কী ব্যাপার, ডাকছিস কেন?'

জানলায় আমি আর কাকা দাঁড়ালাম পাশাপাশি। আমাদের এই জানলাটা খানিকটা দূরে বলে খালি চোখে মানুষগুলোকে ঠিকঠাক মতো চেনা যাচ্ছে না। তবে বাইনোকুলারের ভেতর দিয়ে দেখলে ছবির মতো পরিষ্কার। ওরা যদি যে যার নিজের পোশাকে থাকত, তবে চিনতে তেমন অসুবিধে হতো না। তবে ওরা তিন-চারজন মানুষ পরেছে বিশেষ ধরনের হলুদ পোশাক, মাথায় হেলমেট। সুতরাং এদের ভেতরে ডেভিস আছে কিনা বোঝা শক্ত।

আমরা গুনে দেখলাম, মোট পাঁচজন মানুষ। এদের মধ্যে দুজন বেশ লম্বা। আন্দাজে মনে হয় ছ'ফিটের বেশিই হবে। অন্য তিনজন খুব সম্ভব ডেভিস, রুবেন ও আজিজুর।

ওই লম্বা দুজন মানুষ ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। বাকি তিনজন নিজেদের মধ্যে কীসব আলোচনা শুরু করল। কথা বলতে বলতে দু'তিন বার তাকাল এই বাড়ির দিকে। কী ব্যাপার, ওখানে দাঁড়িয়েও কি আমাদের ওপর নজর রাখছে নাকি!

বাইনোকুলারে চোখ রাখতে রাখতে যখন বেশ ক্লান্ত হয়ে উঠেছি, এমন সময় দুজন রক্ষী ধরে আনল এক ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের চেহারা কেমন যেন চেনা। কাকার হাতে বাইনোকুলার দিয়ে বললাম, 'দেখ তো কাকা, তোমার চেনা কিনা!'

galpoorchhabi.blogspot.in

কাকা বাইনোকুলারে চোখ রেখে বলল, মনে হচ্ছে, এই তো আমাদের সূর্য। এক মুখ দাড়িগোঁফ হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু সঙ্গে দুজন দারোয়ান কেন?'

সত্যি তো, কাকার কথা ভেবে দেখবার মতো।

'যদি সূর্য সত্যিই ওদের দলে যোগ দিত, তবে কি ওর সঙ্গে রক্ষী রাখবার প্রয়োজন হতো! এখন বুঝতে পারছি, সূর্য ওদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। ডেভিস ওকে জোর করে আটকে রেখেছে। এইজন্যই ডেভিস সূর্যের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করতে দেয়নি। পেছন থেকে তোলা কতগুলি আজেবাজে ছবি দেখিয়েছে আমাদের।'

ওদের তিনজনের মধ্যে একজন কথা বলতে শুরু করল। খুব সম্ভব এই লোকটিই ডেভিস, বিশেষত এর দাঁড়াবার ভঙ্গী থেকে তাই মনে হয়। ডেভিসের কথা বলবার ধরনে আদেশ করবার ভঙ্গী। কিন্তু সূর্যকাকা বোধহয় সেই আদেশ মানতে চাইছে না। একটু পরে রেগেমেগে ডেভিস ওখান থেকে দ্রুত হেঁটে গেল আকাশযানের দিকে।

হয়তো ডেভিসের ডাকে, কিংবা নিজেদের প্রয়োজনে আকাশযান থেকে নেমে এলো সেই দুজন লম্বা মানুষ। ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ হাত-পা নেড়ে কী সব কথাবার্তা বলল ডেভিস, তারপর ওরা তিনজনে মিলে আবার এলো সূর্যকাকার দিকে। আবার খানিকক্ষণ শলা-পরামর্শ, কথাবার্তা। কথাবার্তা শেষ হলে রক্ষীরা সূর্যকাকাকে নিয়ে ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

এদিকে ওরা পাঁচজন একে একে সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে গেল আকাশযানের ভেতরে। কী কায়দায় যেন ঝোলানো সিঁড়ি গুটিয়ে গেল আকাশযান বা ফ্লাইং সসারের ভেতরে।

ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুরু হলো। আকাশযান থেকে বেরিয়ে আসা দমকা হাওয়ায় দুলতে শুরু করল আশপাশের গাছ। এক ঝটকায় মাটি থেকে ওপরে উঠে গেল আকাশযানটা, অনেকটা হেলিকপটারের মতো। তারপর প্রচন্ড বেগে মিলিয়ে গেল পশ্চিমের আকাশে। আমার মনে হলো, এতক্ষণ একটা সুন্দর হলুদ প্রজাপতি বসে ছিল এখানে, তারপুর কখন যেন সেটা উড়ে গেল আকাশে।

বাইনোকুলার টেবিলের ওপর রেখে বলল কাকা, 'এখন এই বাড়িতে ডেভিস, রুবেন কিংবা আজিজুর কেউ নেই। পালাতে হলে এই সবচেয়ে ভালো সময়।'

'কিন্তু কীভাবে? আমাদের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। তাছাড়া বাইরে নিশ্চয়ই সারা দিনরাত দারোয়ানরা পাহারা দিচ্ছে। জানলার গ্রিল ভেঙে যে নিচে নামব, তারও উপায় নেই।'

'ঠিকই বলেছিস বাদল। এসব বাধা তো আছেই। ডেভিস থাকলেও থাকবে। তবে এখন সবচেয়ে যা সুবিধে তা হলো ডেভিস নেই। সুতরাং যদি পালাতে হয়, তবে এখনই সবচেয়ে ভালো সময়। ডেভিস ফিরে এলে আর পালানো যাবে না।'

'কিন্তু কীভাবে পালাবে?' আমার গলার স্বরে সন্দেহ।

galpoarchhagal.blogspot.in

'শোন, ওই দারোয়ান যখন দুপুরের খাবার নিয়ে আসবে, তখন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে কাবু করতে হবে।'

'তা না হয় করলে। কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে পারলেও বাড়ি থেকে বেরোবে কী করে? গেটে নিশ্চয়ই বেশ ভালো পাহারার বন্দোবস্ত আছে।'

'খুব সম্ভবত গেটে কোন পাহারা নেই। গেটে পাহারা দেওয়াটা ডেভিসের মতে আদ্যিকালের ব্যবস্থা। আমার ধারণা, এই বাড়ির গেটে পাহারা দিচ্ছে ইলেকট্রনিক আই বা যান্ত্রিক চোখ।'

'অর্থাৎ রোবট, তাই না—' প্রায় চিৎকার করে উঠি।

'তা রোবট বললে ক্ষতি নেই।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি রোবট নাকি মানুষের চেয়েও বেশি সজাগ। ক্লান্ত হয়ে মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু রোবট ক্লান্ত হয় না, ঘুমোয় না। মানুষ অন্যমনস্ক, অসতর্ক হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু রোবটের দৃষ্টি সব সময় তীক্ষ্ম সজাগ। এমন রোবটের চোখকে আমরা ফাঁকি দেব কেমন করে!'

'তুই ভালো কথা বলেছিস বাদল। রোবট খুবই ভালো পাহারাদার সন্দেহ নেই, কিন্তু সবই নির্ভর করছে ডেভিসের ঐ কণ্ট্রোল রুমের ওপর। ডেভিসের ঐ কণ্ট্রোল রুমকে যদি অকেজো করা যায়, তবে মেন গেটের রোবটও অকেজো হয়ে যাবে। কি বলিস!'

'কিন্তু কণ্ট্রোল রুম কেউ না কেউ তো পাহারা দিচ্ছেই। সেখানে ঢুকবে কী করে? তাই আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। যদি এই বাড়ির মেন সুইচ কোন রকমে অফ করে দেওয়া যায়, তবে—'

'খুবই ভালো প্ল্যান দিয়েছিস। তবে কী জানিস, বিদ্যুৎ বন্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারি চালু হবার বন্দোবস্ত আছে নিশ্চয়ই।'

এরপর অনেকক্ষণ ধরে আমি আর কাকা বসে বসে কীভাবে কী করা হবে, সে সম্বন্ধে নানারকম পরিকল্পনা করলাম।

॥ দশ ॥

দারোয়ান খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, এভাবে অপেক্ষা করছি, এমন সময় দরজা খোলার শব্দ। আমি আর কাকা সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাশে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরেই দরজা খুলে যে ঢুকল তাকে দেখে আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

কাকা বলল, 'আপনি? আপনি এখানে?'

তেজকুরির ক্যাম্পের মিঃ হীরেন ভৌমিক বললেন, 'ভাগ্যের পরিহাস বলতে পারেন। না হলে আপনার সঙ্গে আমার এভাবে দেখা হবে কেন?'

galporchhalbi.blogspot.in

'সমস্ত ব্যাপারটা আমার কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। সব কিছু একটু খুলে বলবেন আমাকে।' উদ্‌গ্রীব গলার স্বর কাকার।

ঘরের দরজাটা পুরোপুরি ভালো করে বন্ধ করে একটা চেয়ারে বসলেন মিঃ হীরেন ভৌমিক। ভদ্রলোক হাঁফাচ্ছেন। চোখে-মুখে বেশ ভয়ের ছাপ। ওকে আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিলাম। সূর্যকাকার তেজকুরি ক্যাম্পে প্রথম যখন দেখেছিলাম, তখনই আমার এঁকে বিশেষ ভালো লাগেনি। তবু আমি কখনোই ভাবিনি ইনিও ডেভিসের দলে নাম লিখিয়েছেন।

দরজা বন্ধ করে নিচু গলায় হীরেনবাবু যা বললেন তা মোটামুটি এইঃ

মিঃ ডেভিস যে কে এবং কী, সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না হীরেনবাবু। শুধু এইটুকু জানা আছে ভদ্রলোক প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এক ব্যক্তি, যদিও ঠিক বিজ্ঞানী একে বলা যাবে না। ভদ্রলোক আগে নাকি আমেরিকার কোন এক ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। সেখানে কাজ করবার সময় বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ওর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। আমেরিকার সেই ল্যাবরেটরিতে একজন বিজ্ঞানী ইউরেনিয়াম নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। সেই বিজ্ঞানীর নাম ছিল চার্লস ডেভিস। শুনেছি সেই বিজ্ঞানীই নাকি ইউরেনিয়ামের নতুন আইসোটোপ বের করেন আর তার নাম দেন ইউ ২৩৩। শোনা গেছে, এই আইসোটোপ থেকে এমন পারমাণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব, যা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাবে কিন্তু তা থেকে প্রায় কোন তেজস্ক্রিয় ভস্ম বেরোবে না। যা অল্প-সল্প বেরোবে, তা তেমন বিপদজনক নয়। তাছাড়া পারমাণবিক শক্তি তৈরির কাজেও এই আইসোটোপের জুড়ি নেই। কারো কারো ধারণা, চার্লস ডেভিসের এই গবেষণাপত্র নাকি চুরি করে এনেছে এই ডেভিস। খুব সম্ভবত এর আসল নাম ডেভিস নয়, বিজ্ঞানী ডেভিসের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের নাম রেখেছে। এদিকে সেই বিজ্ঞানী ডেভিসও আমেরিকা থেকে নিরুদ্দেশ। কোথাও তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকের ধারণা, এই ডেভিস বিজ্ঞানী ডেভিসকে মেরে ফেলে ওঁর সব গবেষণাপত্র হাত করেছে। অথবা এমনও হতে পারে ঐ বিজ্ঞানী ডেভিসকে কোথাও গুম করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যেমনভাবে এই বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীকে। এই সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীকে গুম করার কাজে নিজের দোষ স্বীকার করলেন হীরেনবাবু। মিষ্টি কথায় নাকি এই নকল ডেভিস ভুলিয়েছিল হীরেন ভৌমিককে।

নকল ডেভিস বলেছিল হীরেন ভৌমিককে, বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য এক গবেষণা চালানো হচ্ছে। এতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের যোগ দেওয়া দরকার। এতে যোগ দিলে পৃথিবীর যেমন ভালো হবে, নিজেরও কোন ক্ষতি নেই। কারণ এই গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করছে পৃথিবীবিখ্যাত কয়েকটি সংস্থা।

শুনতে শুনতে এক সময় কাকা বলল, 'আশ্চর্য, ডেভিসের এতসব কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনি।'

galporchhabi.blogspot.in

হীরেন ভৌমিক বললেন, 'আমার কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। পুরোটা না বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। এবার বাকিটা শুনুন। নকল ডেভিসের কথায় ভুলে ওর দলে যোগ দেই। সে আজ প্রায় দু'বছর আগের কথা। তখন পুরুলিয়ার এই পাহাড়ী অঞ্চলে ডেভিসের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সে সময় আমাকে বিশেষ কিছু করতে হতো না। শুধু আমাদের এখানে কী কী কাজকর্ম হতো, শুধু তাই জানাতাম। কখনো কখনো ডেভিসের কথামতো অফিস থেকে কিছু কিছু গোপন রিপোর্ট ওর হাতে এনে দিতাম। এসব কাজের জন্য ডেভিসের কাছ থেকে প্রতি মাসে পেতাম এক হাজার টাকা। বুঝতেই পারছেন, এ বাজারে টাকার দরকার যথেষ্ট। তাই ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছিলাম ডেভিসের জালে।'

হীরেন ভৌমিক একটু থামলেন, দরজার দিকে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করলেন, তারপর আবার শুরু করলেন, 'পুরুলিয়ার এই বাড়ি তৈরি শেষ হবার পর ডেভিসের নজর পড়ল ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীর দিকে। আর ডেভিস আমাকে এ ব্যাপারে পুরো দায়িত্ব দিল। আপনি তো জানেনই, ডঃ চ্যাটার্জী কেমন একরোখা মানুষ। টাকাপয়সা দিয়ে ওর মতো মানুষকে কেনা শক্ত। ডঃ চ্যাটার্জীর কাছে এ ধরনের প্রস্তাব করা মাত্র উনি তো চটে ফায়ার। আমাকে বললেন, এই প্রস্তাব আর একবার করলে উনি আমাকে সাসপেন্ড করবেন। রুবেন সিংহকে তো ডিসমিস করেই দিলেন। অবশ্য এর ফল হলো খারাপ। তখনকার মতো চুপ করে গেলেও আমরা ওর শত্রু হয়ে গেলাম। পরে আমাদের পাঠানো খবর অনুযায়ী পুরুলিয়ার বাস-স্ট্যান্ডের কাছ থেকে ডঃ চ্যাটার্জীকে লোপাট করল ডেভিসের লোক। এখনো পর্যন্ত ডেভিসের কাছে ডঃ চ্যাটার্জী বন্দী হয়ে আছেন।'

সূর্যকাকার বন্দী হয়ে থাকার কথায় সৃজনকাকা তাকাল হীরেন ভৌমিকের দিকে, 'আচ্ছা মিঃ ভৌমিক, ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে দিতে পারবেন?'

'সেই ব্যাপারেই তো আপনার কাছে এসেছি। ডেভিসের হাতে উনি আটক হবার পর থেকে আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হয়নি। আসলে আমি সংকোচে দেখা করতে পারিনি ওর সঙ্গে। তাছাড়া ডঃ চ্যাটার্জীকে যে ঠিক কোথায় কোন্ ঘরে রাখা হয়েছে, তা জানতাম না। কিন্তু আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। আর যাবার আগে এই বাড়িটা ধ্বংস করে যেতে হবে। কারণ, জানতে পেরেছি, বিজ্ঞানী ডেভিসের ফরমূলা অনুযায়ী ইউরেনিয়ামের নতুন আইসোটোপ ইউ ২৩৩ ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়েছে। আর এই নকল ডেভিস এই ফরমূলা বিক্রি করছে ভারতের এক শত্রুদেশের কাছে। আজ সকালে সেই দেশের দুজন প্রতিনিধি এসেছিল এখানে গোপন এরোপ্লেনে চড়ে।'

হীরেন ভৌমিকের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, আরে আজ সকালেই তো ওদের দেখলাম। ওরা চলে গেল একটা হলুদ রংয়ের ফ্লাইং সসারে চড়ে।'

galporchhabi.blogspot.in

'ঠিক বলেছ। ওই দুজনই তো সেই শত্রুদেশের এজেণ্ট। সঙ্গে ছিল ডেভিস, রুবেন আর আজিজুর। তাই না?'

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন দুপুর প্রায় তিনটে। হাতে আর বেশি সময় নেই। মনে হয় সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যেই ফিরে আসবে ওরা।'

কাকা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গেছে ওরা?'

'ঠিক জানি না। তবে যেখানেই যাক, সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে ফিরবে। সে রকমই তো বলে গেছে। সুতরাং পালাতে হলে দু' ঘণ্টার মধ্যেই যা হোক কিছু করতে হবে। এরপর হয়তো এই সুযোগ ইহজীবনে আর পাওয়া যাবে না।'

এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে কুচিকুচি করছিল কাকা। মুখচোখ দেখে মনে হলো, গভীর কোন কিছু চিন্তা করছে। হীরেন ভৌমিকের সব কথা ওর কানে ঢুকছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু হীরেনবাবুর কথা শেষ হওয়া মাত্র সৃজনকাকার মুখের ভাব আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

'হীরেনবাবু, আপনি আমাদের সাহায্য করতে চাইছেন, খুবই ভালো কথা। কিন্তু কেন, সেকথা আপনি বলেননি। ডেভিসের সঙ্গে আপনার এমন কী হলো, যে আপনি পালাতে চাইছেন!'

কাকার কথায় একটু যেন থমকে গেলেন হীরেন ভৌমিক। কিন্তু একটু পরেই সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর বললেন, 'সে এক বিরাট কাহিনী। সবকিছু বলবার সময় নেই। তাই সংক্ষেপে বলছি। ডেভিস ও তার দলবল চলে যাওয়ার পর ওর ড্রয়ার হাতড়ে এমন কতগুলি ডকুমেণ্ট পেয়েছি, যা পড়ে আমি শিউরে উঠেছি। সেই প্ল্যানে রয়েছে, আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে ইউ ২৩৩-এর ফরমূলা, ডিজাইন ইত্যাদি সবকিছুই তুলে দেওয়া হবে ওই এজেণ্টদের হাতে। তারপর ইউ ২৩৩ বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে এই বাড়ি। এই বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই পুড়ে মরব। শুধু বাঁচবে ডেভিস আর ওর দুজন নন্দী ভৃঙ্গী রুবেন আর আজিজুর।'

হীরেন ভৌমিকের কথা শুনে আমি শিউরে উঠে বললাম, 'কী ভয়ঙ্কর!'

আন্দামানের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা মনে পড়ল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর তুলনায় সেই অভিযানও যেন অনেক সহজ ছিল।

হীরেন ভৌমিক বলে যান, 'অথচ এই বাড়িতে এখন জনা দশেক মানুষ কাজ করে যাচ্ছেন। বন্দী রয়েছেন আরো প্রায় পাঁচ-ছ' জন মানুষ। তাছাড়া রয়েছেন আপনারা দু'জন। আমার ধারণা, ডঃ সূর্য চ্যাটার্জীর মতোই এ বাড়িতেই বন্দী হয়ে রয়েছেন বিজ্ঞানী ডেভিস।'

'তাই নাকি! কিন্তু কোথায় কোন্ ঘরে আছেন তা জানতে পেরেছেন কি?' সৃজনকাকা জিজ্ঞেস করে।

'না, তা বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এখানকার রক্ষীদের দু' একজনের সঙ্গে

galporchhabi.blogspot.in

কথা বলে মনে হয়েছে, উনি বোধহয় আর বেঁচে নেই অথবা ওকে আগেই মেরে ফেলা হয়েছে। অবশ্য সূর্য চ্যাটার্জী কোন্ ঘরে বন্দী আছেন, সে খবর জোগাড় করেছি। চলুন আর দেরি করবেন না।'

কাকার কথামতো তাড়াতাড়ি সবকিছু গুছিয়ে নেই। অবশ্য এমন কী আর গুছোবার আছে। সঙ্গে কেবল একটা কিট ব্যাগ। কিন্তু কিট ব্যাগ গুছোতে গিয়ে দেখি, ওয়াকি-টকি যন্ত্রটা।

জিজ্ঞেস করি, 'খবর পাঠিয়েছ কাকা?'

কাকা বলে, 'তোর চিন্তার কোন কারণ নেই। শিরীষ পালকে এখান থেকে খবর পাঠিয়েছি। তাছাড়া কালীপদ নিশ্চয়ই খবর পাঠিয়েছে। ওরা এলো বলে—'

হীরেন ভৌমিক বলেন, 'কিন্তু শিরীষ পালের লোক এখানে বোধহয় পৌঁছতে পারবেন না। কোন গাড়ির পক্ষে এখানে পৌঁছনো সম্ভব নয়, কারণ কোন রাস্তাই নেই। হেঁটে আসাও খুব মুশকিল। কারণ ডেভিসের এই বাড়ি তৈরি হয়েছে গোলাকার এক পাহাড়ের গর্তের ভেতরে। এই পাহাড়টা অনেকটা আগ্নেয়গিরির পাহাড়ের মতো। কে জানে কোন সুদূর অতীতে হয়তো এখানে ছিল এক সজীব আগ্নেয়গিরি।'

হীরেন ভৌমিকের কথায় এবার আমার অবাক হবার পালা। আমি বলি, 'দুৎ, আগ্নেয়গিরি হবে কী করে? এই ঘরের জানলা দিয়ে দেখেছি, এই বাড়ির চারদিকে কেমন সুন্দর মাঠ, বাগান, চারিদিকে সবুজ বন, আগুনের ছিটেফোঁটাও নেই—'

আমাকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বলে কাকা, 'আরে এখনকার কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে হয়তো এক লাখ বছর আগেকার, যখন এই পাহাড়ের গহ্বর থেকে গরম লাভা, ছাই বেরোত। এখন সে-সব গরম লাভা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তারপর তারই ওপর তৈরি হয়েছে বনজঙ্গল অরণ্যানী। এই সবুজ বনের শোভা দেখলে কারো মনেই পড়বে না, কোনদিন এখানে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ছিল।'

॥ এগারো ॥

হীরেন ভৌমিক বলেন, 'চলুন মিঃ বোস, আর দেরি করবেন না। ঘর থেকে বেরোনো যাক।'

হীরেনবাবুর কথামতো পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরোলাম আমরা। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আমাদের সতর্কভাবে চলতে হচ্ছে, যাতে ডেভিসের বিশ্বস্ত রক্ষীদের হাতে ধরা না পড়তে হয়। তবে একমাত্র বাঁচোয়া, সঙ্গে আছেন হীরেন ভৌমিক। ওকে দেখলে কেউ হয়তো তেমন সন্দেহ করবে না।

লিফটে চেপে একতলায় নেমে এলাম আমরা। প্রথমে আমাদের যে ঘরটায় রেখেছিল, সেই ঘরটায় এখন বড় তালা ঝুলছে। তবে বাইরে কোন রক্ষী নেই।

galporchhabi.blogspot.in

হীরেনবাবুর কাছে তালার চাবি পাওয়া গেল। তালা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখি, খাটের ওপর চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে আছে কালীমুদ্দি।

আমাদের দেখে কালীমুদ্দির বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটল। আবেগে কী যেন বলতে গেল আমাদের। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে কথা বলতে মানা করল কাকা।

কালীমুদ্দি আমাদের অনুসরণ করল নীরবে। ফিসফিস করে ওর কানে কানে কী যেন বলল কাকা।

হীরেন ভৌমিকের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা। উনি বললেন, 'ডঃ সূর্যপ্রতিম চ্যাটার্জীকে রেখেছে বেসমেণ্টের ঘরে। কিন্তু এখন ওখানে যাওয়ার পথে বেশ ঝামেলা রয়েছে। দু'তিনজন রক্ষী পাহারা দিচ্ছে বেসমেণ্টের দরজায়। ওরা খোদ ডেভিসের লোক, ওদের হাত করতে পারিনি।'

কাকা চিন্তিত গলায় বলল, 'তবে উপায়?'

'উপায় একটা আছে। তবে খুবই কঠিন কাজ। সে যাই হোক, চলুন ডেভিসের কনট্রোল রুমে যাওয়া যাক।'

আবার লিফটে চড়ে ওপরে গেলাম তিনজন। নিচে বেসমেণ্টের দরজার ওপর লক্ষ রাখবার জন্য রেখে যাওয়া হলো কালীমুদ্দিকে। ডেভিসের কনট্রোল রুমের ভেতরে ছিল একজন রক্ষী শ্রেণীর লোক, পরনে ইউ ২৩৩ মার্কা ইউনিফর্ম।

হীরেন ভৌমিক ওকে কী যেন বলতেই চলে গেল লোকটা। হীরেনবাবু আমাদের সবকিছু বোঝাতে শুরু করলে কাকা বলল, 'ডেভিস আমাদের সবকিছু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। শুধু বোঝায়নি গোয়েন্দাগিরি করার ব্যবস্থাগুলি। আপনি সেগুলি একটু দেখান তো আমাদের।'

হীরেনবাবু এদিক ওদিকে দু'তিনটে প্লাগ লাগালেন, তারপর একটা সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল একটা টি-ভি'র পর্দা। টি-ভি'র পর্দায় ভেসে উঠল বেসমেণ্টের একটা ছোট ঘর। একটি খাট, টেবিল ও চেয়ার। টেবিলে মাথা রেখে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। আমি চমকে উঠলাম। এ কী চেহারা হয়েছে সূর্যকাকার! ক্লান্ত ম্লান বিষণ্ণ রুগ্ণ। অথচ ডেভিস কী ধাপ্পাই না দিয়েছিল আমাদের।

আমি ভুল করে ডেকে ফেললাম, 'সূর্যকাকা, এই তো আমরা এখানে। এদিকে তাকান—'

ডেকেই বুঝতে পারলাম, ভুল করেছি। কাকা আমার পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, 'ঘাবড়াস না। আর একটু পরেই আমরা উদ্ধার করব তোর সূর্যকাকাকে।'

এদিকে হীরেন ভৌমিক অন্য একটা সুইচ টিপতেই আর একটা ছবি ভেসে উঠল অন্য টি-ভি'র পর্দায়। জঙ্গলের ভেতরে বাড়ির ছবি। ঠিক দুর্গের মতো দেখতে। হীরেন ভৌমিক আমাদের বোঝাতে শুরু করলেন, 'এই যে জঙ্গলের ভেতরে বাড়ির ছবিটা দেখছেন, এটা এই বাড়িরই সামনের দিক। ছবির এই অংশটা দেখুন—'

galpopathabhi.blogspot.in

এই বলে আর একটা সুইচের নব আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগলেন। ছবির একটা অংশ ক্রমে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবার বুঝতে পারলাম ডেভিসের এই বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কু-আকৃতির এক পাহাড়ের গর্তে। এই ছোট গোল পাহাড়কে ঘিরে গভীর উপত্যকা, যা অনেকটা পরিখার মতো ঘিরে রেখেছে ডেভিসের এই দুর্গ বা দুর্গ পাহাড়কে। এই দুর্গ পাহাড়ের ওপাশে আর একটি মালভূমি। মাঝখানে প্রায় পনেরো কুড়ি ফিটের ফাঁক।

হীরেন ভৌমিক আবার বোঝাতে শুরু করেন, 'এই টি-ভি'র ক্যামেরায় টেলি-লেনস লাগানো আছে। তাই জঙ্গলের এদিকটার পুরো ছবি পাওয়া যায় টি-ভি'র পর্দায়। কেউ যদি জঙ্গলের দিক থেকে ডেভিসের বাড়ির দিকে—'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি, 'বাড়ি না বলে বলুন দুর্গপাহাড়—' হীরেন ভৌমিক হেসে বলেন, 'বাঃ, দারুণ নাম তো! ঠিক আছে, এখন থেকে দুর্গপাহাড়ই বলব। যা বলছিলাম, যদি কেউ এই দুর্গপাহাড়ের দিকে এগোতে চেষ্টা করে, তবে ডেভিসের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও এই ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না—'

হীরেনবাবু যখন আমাদের বোঝাচ্ছিলেন, তখন আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম টি-ভি'র পর্দায়। কোন কিছু খুঁজে বার করতে নয়, এমনিই চোখ রেখেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো ছবির জঙ্গলে কারা যেন নড়ে চড়ে উঠল।

কাকাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'ঐ যে কারা যেন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেয়েছ?'

আমার কথায় একটুও অবাক না হয়ে জবাব দিল কাকা, 'তুই দেখবার আগেই জানতাম। ওরা তো শিরীষ পালের দলবল।'

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের ঢেউ খেলে যায় আমার কথায়, 'তাই নাকি! কেল্লা ফতে। ডেভিসের এই দুর্গ থেকে বেরোতে পারব তবে!'

হীরেন ভৌমিক বলল, 'তার কিছু বাকি আছে। শিরীষ পালের দল পরিখা পেরোবে কী করে?'

ছবির দিকে তাকিয়ে আমি চিন্তায় পড়ে যাই, 'এখন কী হবে?'

'ঘাবড়াও মাৎ।' এই বলে হীরেন ভৌমিক ডান দিকের দেয়ালে লাগানো দু'তিনটে সুইচ টেপে। তারপর অবাক কান্ড! আলিবাবার চিচিং ফাঁক-এর মতো পরিখার ওপর নেমে আসে ঝকঝকে ইস্পাতের সেতু। একটা মাইকের মারফৎ শিরীষ পালের উদ্দেশে কী সব নির্দেশ দিতে শুরু করে।

সৃজনকাকা টি-ভি'র পর্দার কাছে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ করছিল সতর্কভাবে। পরিখার ওপারে শিরীষ পালের দলবল, ওদিকে মাইকে হীরেন ভৌমিকের কণ্ঠস্বর, এখানে দুর্গপাহাড়ে আমাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—সব মিলিয়ে আমার মনে উত্তেজনা বাড়ছিল। কাকাকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কাকা ঝট করে আমার মুখে হাত রেখে বলল, 'চুপ, একদম কথা বলিস না—'

galpokathabl.blogspot.in

কাকার কথায় একটু অবাক হয়ে হীরেনবাবু তাকালেন সৃজনকাকার মুখে।

'শুনতে পাচ্ছেন?'

'কই না তো!'

'শুনতে পাচ্ছেন না! ভালো করে শুনুন, ডেভিসের হলুদ প্লেন বোধহয় ফিরে আসছে। তারই গুঞ্জন—'

হীরেনবাবু বাতাসে কান পাতলেন, তারপর বললেন,

'সত্যিই তো!'

আর একটা টি-ভি'র সুইচ টিপতেই ফুটে উঠল আকাশের ছবি। ভুল বলেছি, আসলে এটা রাডার। খুব ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম, রাডারের পর্দার মাঝখানে একটা প্রজাপতি উড়ছে।

'ওটা প্রজাপতি নয়। ওটাই ডেভিসের এরোপ্লেন। এখন উপায়?' হীরেন ভৌমিকের মুখে আতঙ্কের ছাপ।

কিন্তু সৃজনকাকা অবিচল, ভয়ের কোন লক্ষণ নেই মুখে।

'মিঃ ভৌমিক, ঘাবড়ালে চলবে না। যে কোনভাবেই হোক, পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আপনি একটা কথা ভুল যাচ্ছেন কেন, আমরা দুর্গের ভেতরে আর ডেভিস বাইরে। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি আমাদের কব্জায়। সেরকম প্রয়োজন হলে, দুর্গের ভেতর থেকে গুলি করে শেষ করে দেব ওদের। বুঝেছেন?'

কথা শুনে হীরেন ভৌমিক কোন কথা বললেন না, শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কাকার দিকে।

'প্লিজ মিঃ ভৌমিক, চুপচাপ বসে থাকবেন না। ডেভিসের প্লেনের এখানে নামতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট পাঁচেক।'

'আচ্ছা, এর মধ্যে এমন কিছু কি করা সম্ভব, যাতে ডেভিসের প্লেন এখানে নামতে না পারে। ধরুন, এখান থেকে যদি কোন উলটো খবর পাঠানো যায় প্লেনে?'

'সেটা সম্ভব নয়। কারণ এ সব কাজ করত আজিজুর। তাই আমি ঠিক জানি না, কী করে উড়ন্ত প্লেনে খবর পাঠানো হয়। আর তাছাড়া খবর পাঠিয়েও কোন লাভ নেই। কারণ ডেভিস অসম্ভব ধুরন্ধর লোক। খবর পাঠালে আরো বেশি সন্দেহ হবে ওর।'

কাকা আর হীরেনবাবুর কথার ফাঁকে ফাঁকে আমি তাকাচ্ছিলাম টি-ভি'র পর্দায়।

আমি বলে উঠলাম, 'ঐ যে দেখ কাকা, শিরীষ পাল তার দলবল নিয়ে সেতু পেরোচ্ছেন—'

সঙ্গে সঙ্গে কাকা ছুটে গেল মাইকের কাছে, 'মিঃ পাল, সেতুটা সাবধানে পেরিয়ে আসুন। তারপর ডানদিকে—'

টি-ভি'র পরদায় দেখতে পেলাম, কাকার কথা শুনতে পেয়ে শিরীষ পাল ও তার

galporchhabi.blogspot.in

দলবল তাড়াতাড়ি সেতু পেরিয়ে এপারে চলে এলেন। তারপর মনে হয় রাস্তা খুঁজছেন। ওদিকে মাইকে আরো নানা নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে কাকা।

॥ বারো ॥

ইতিমধ্যে রাডারের পর্দায় প্লেনের ছবি অনেক বড় হয়ে উঠেছে। একটু পরেই এই দুর্গের হেলিপ্যাডে নেমে আসবে। এখন ভালো করে প্লেনটাকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে অনেকটা ফ্লাইং সসারের মতো হলেও কাজকর্ম অনেকটা হেলিকপটারের মতো। তবে স্পীড অনেক বেশি।

কাকা বলল, 'চলুন, বেসমেণ্টে নামতে হবে যে এবার। ডেভিস পেঁাছে গেলে বড় দেরি হয়ে যাবে।'

'কিন্তু বেসমেণ্টে কড়া পাহারা রয়েছে সব সময়। ওখানে ঢোকা প্রায় অসম্ভব—'

'পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। ঠিক আছে, আপনি এখানে থাকুন। আমি আর বাদল যাচ্ছি।'

এবার যেন লজ্জা পেলেন হীরেনবাবু, 'সে কি কথা! বাদল যাবে, আর আমি যাব না।'

আমরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। লিফটের জন্য আর অপেক্ষা করিনি। একতলায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিল কালীমুদ্দি।

বেসমেণ্টের গেট লোহার। সাদা রং করা। ঝট করে দেয়াল বলেই ভুল হয়। দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখলাম, ভেতর থেকে বন্ধ।

হীরেন ভৌমিক বললেন, 'ওভাবে ঠেললে কোনদিন দরজা খুলবে না।'

দরজার মাঝামাঝি একটা গোলাকার নব। সেটাকে টিপে জোরে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। দরজার ভেতরে একটা টুলের ওপর বসে ঢুলছিল একজন রক্ষী। পরনে ইউ ২৩৩ মার্কা পোশাক। আমরা ঢুকতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কোমরের বেল্ট থেকে টেনে খুলতে গেল পিস্তল। কিন্তু তার আগেই কাকা দুমাদুম ঘুষি চালাল লোকটার মুখে। কিন্তু লোকটা প্রচণ্ড পালোয়ান। ঘুষি খেয়ে প্রথমে উল্টে পড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লোকটা। কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎ-গতিতে লোকটার কোমর থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিয়েছে কাকা। কাকার হাতে পিস্তল দেখে থমকে দাঁড়াল।

গম্ভীর স্বরে আদেশ দিল কাকা, 'হ্যান্ডস আপ—' সঙ্গে সঙ্গে ভালো মানুষের মতো দুটো হাত ওপরে তুলল লোকটা। তারপর ওকে আমরা বেঁধে ফেললাম ঝটপট।

বেসমেণ্টে লম্বা করিডরের একপাশে পরপর অনেকগুলি ঘর। প্রথম দরজায় তালা ছিল না। সেটা টেনে খুলল কালীমুদ্দি। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই, কেবল

galpokhabi.blogspot.in

কিছু যন্ত্রপাতি ছাড়া। দ্বিতীয় ঘরটায় তালা দেওয়া। রক্ষীর পকেট থেকে যে

কাকা দুমাদুম ঘুষি চালাল লোকটার মুখে (পৃঃ ৫৮)

galporchhabi.blogspot.in

চাবির গোছা পাওয়া গিয়েছিল তাতেই খুলে গেল তালা। দরজা খুলে ভেতরে

ঢুকতেই আমাদের মুখে হাসি খেলে গেল। ভেতরে একটা চেয়ারে বসে কী যেন লিখছেন সূর্যকাকা। কিন্তু সূর্যকাকার চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। সারা মুখে দাড়িগোঁফ। চেহারা দেখে মনটা একটু দমে গেলেও দেখা তো পেয়েছি। তাতেই আমরা বেশ খুশি।

আমাদের দেখে খুবই অবাক হয়ে গেলেন সূর্যকাকা। সৃজনকাকাকে চিনতে পারেননি প্রথমে। কিন্তু কাকা ওকে জড়িয়ে ধরলে বললেন, 'ওঃ, তুই সৃজন। কেমন করে এলি?

'সে কথা পরে। এখন বল, কেমন আছিস?

'আমার আবার থাকা! ডেভিসের হাতে বন্দী হয়ে আছি। কাজ শেষ হলেই আমাদের মেরে ফেলবে ডেভিস। বড় ভয়ংকর লোক এই নকল ডেভিস। কত বিজ্ঞানীকে যে মেরে ফেলেছে ও, তার শেষ নেই। যাক সে কথা! তোরাও কি ডেভিসের হাতে বন্দী হয়েছিস?'

'হ্যাঁ, ডেভিসের হাতে প্রথমে বন্দী হলেও এখন ওকেই আমরা বন্দী করব।'

সূর্যকাকার ম্লান বিষণ্ণ মুখে অস্তগামী সূর্যের মতো এক টুকরো হাসি। সে হাসিতে যেন অবিশ্বাসের ছায়া। সে হাসি যেন বলতে চাইছে, ডেভিসকে তোমরা চেন না। আমি চিনি। বড় ভয়ংকর লোক সে। ওকে বন্দী করা যার তার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রথমে হীরেন ভৌমিককে দেখতে পাননি। এবার দেখতে পেয়ে সূর্যকাকার মুখের চেহারা পালটে গেল।

কঠিন গলায় বললেন সূর্যকাকা, 'কি হীরেনবাবু, আপনি এখানে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আমি তো জানতাম, আপনিও ডেভিসের এক বশংবদ শাগরেদ। আপনি আবার ভোল পাল্টালেন কবে?'

সূর্যকাকার কথায় লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলেন হীরেন ভৌমিক, 'আমাকে ক্ষমা করুন স্যার। লোভে পড়ে প্রচণ্ড অপরাধ করেছি। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন—'

'কুইক, তাড়াতাড়ি। আর বেশি সময় হাতে নেই সূর্য। যে কোন সময় ডেভিস এসে পড়তে পারে। এরই মধ্যে কিছু করতে হবে।'

কাকার কথায় হুঁশ এলো আমাদের। আমরা সবাই ছুটলাম বেসমেণ্টের দরজায়। দরজার কাছে যে রক্ষীকে বেঁধে রেখেছিলাম, সেই লোকটা নেই। কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়? যা হোক, অত ভাবনা-চিন্তা করবার সময় নেই আমাদের। পড়িমড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে ছুটলাম মেইন গেটের দিকে। মেইন গেটের কাছে পেঁছে দেখি, বিরাট রোলিং সাটার দরজা তখন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর শুরু হয়েছে বিকট সাইরেনের শব্দ। বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, এ সবই ঐ পলাতক রক্ষীর কাজ। যা হোক, দরজা পুরোপুরি বন্ধ হবার আগেই কোনরকমে বাইরে

galporchhobi.blogspot.in

বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে বেরিয়েই কী আনন্দ আমার। যাক, ডেভিসের দুর্গ থেকে বেরোতে পেরেছি তাহলে।

কিন্তু তবু রেহাই নেই। একটু দূরেই দেখি ডেভিসের হলুদ ফ্লাইং সসার তখন নামছে মাটিতে। নামবার সময় থরথর করে একবার কেঁপে উঠল হলুদ রংয়ের প্লেনটা। আমরা একটু দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখছি এরোপ্লেনের ওপর। দরজাটা খুলল, কিন্তু কেউ ভেতর থেকে বেরোচ্ছে না। কী ব্যাপার? অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তবু কেউ বেরোলো না। তবে কি সেই লোকটা রেডিও মেসেজে সব খবর জানিয়ে দিয়েছে ডেভিসকে?

হঠাৎ প্লেনের ভেতর থেকে কে যেন গুলি চালাতে শুরু করল। একটা গুলি আমাদের থামের পাশ ঘেঁষে চলে গেল। কাকাও সঙ্গে সঙ্গে হাতের পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল এরোপ্লেনের দিকে।

'হ্যান্ডস আপ—' কে যেন চিৎকার করে হেঁকে উঠল। থামের পাশ থেকে তাকিয়ে দেখি, একটু দূরে ঝোপের আড়াল থেকে আমাদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে শিরীষ পালের দলবল। উরি ব্বাবা, কী ভয়ংকর ব্যাপার। ওদিকে ডেভিসের ইলেকট্রনিক পিস্তলের গুলি, এদিকে শিরীষ পালের রাইফেলের আক্রমণ। একেবারে সাঁড়াশি বাহিনীর মধ্যে পড়ে গেছি। বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, দূর থেকে আমাদের চিনতে পারছেন না শিরীষ পাল।

'সারেন্ডার অর উই ফায়ার'—শিরীষ পালের শেষ সতর্কবাণী শুনতে পেলাম। কাকার পরামর্শ মতো আমরা দু'হাত তুলে চিৎকার করলাম। 'মিঃ পাল, গুলি করবেন না। আমরা সৃজন বোসের দল—'

সৃজন বোসের নামটা কানে যাওয়া মাত্র শিরীষ পাল সঙ্গে সঙ্গে নিজের লোকদের থামালেন।

কিন্তু ওদিকে হলুদ এরোপ্লেন থেকে তখন সমানে গুলি চলছে। এরই মধ্যে একটা গুলি এসে লাগল হীরেন ভৌমিকের পায়ে। একটা চাপা আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে কাকা ঝুঁকে পড়ল আহত হীরেনবাবুর ওপর। ইতিমধ্যে শিরীষ পালের দলবল এসে পড়েছে এদিকে। রাইফেলের নল ঘুরে গেছে হলুদ এরোপ্লেনের দিকে।

হলুদ এরোপ্লেনের দরজা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। মাটি থেকে আবার আকাশে উঠতে শুরু করেছে। ওদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে কাকা চিৎকার করে উঠল।

'সবাই ছুটুন ব্রিজের দিকে। কুইক—'

সৃজনকাকার কথায় এমন এক আদেশের সুর যে সবাই পড়িমরি করে ছুটল ব্রিজের দিকে। এমন কি শিরীষ পালের দলবল পর্যন্ত। হীরেনবাবুও কালীমুন্দির কাঁধে ভর দিয়ে কোনরকমে ছুটে চলেছে ব্রিজের দিকে। পাঁচশো সিঁড়ি বেয়ে আমরা সবাই সবে মাত্র ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে পা দিয়েছি, এমন সময় আকাশের বুকে উড়তে

galpofhhabi.blogspot.in

থাকা হলুদ এরোপ্লেন থেকে প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা পড়ল ডেভিসের নিজেরই

মাটির দিকে নেমে আসছে জ্বলন্ত সসার (পৃঃ ৬৩)

তৈরি দুর্গের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িটা জ্বলতে শুরু করল প্রচণ্ড এক

galpopohhabi.blogspot.in

অগ্নিকান্ডে। ব্রিজের ওপারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, দুর্গপাহাড় জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে দুমদাম শব্দে বাড়িটাও ফাটছে। এক সময় ওই পাহাড়ের সঙ্গে যোগসূত্র ব্রিজটা ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। সমস্ত দৃশ্য দেখে সূর্যকাকা দু'হাত দিয়ে নিজের দু' চোখ চেপে ধরলেন।

'হায় হায়! সব গেল, সব নষ্ট হয়ে গেল। উইসমূলার ও পার্থসারথিও বোধহয় বাঁচলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ইউ ২৩৩-র ফরমূলাও গেল। ইউ ব্রুট।' দাঁতে দাঁত চেপে ডেভিসের উদ্দেশে অভিশম্পাত দিলেন সূর্যকাকা। আর একবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আকাশে তাকিয়ে দেখি, হলুদ ফ্লাইং সসারে আগুন ধরে গেছে। উল্কার মতো দ্রুত মাটির দিকে নেমে আসছে জ্বলন্ত এরোপ্লেন। এই দৃশ্য দেখে আমাদের মুখে বিজয়ের হাসি।

* * * *

আমরা সবাই পুরুলিয়ার বাংলোয় বসে গল্প করছিলাম। অসীম দত্ত ও মিঃ নিগমও সেখানে হাজির। শুধু হীরেন ভৌমিক পুরুলিয়া হাসপাতালে। সৃজনকাকা আমাদের অভিযানের কথা বিস্তারিতভাবে বলছিল।

এতদিনে সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'আচ্ছা কাকা, তোমার সেই নম্বরের রহস্যটা তো বললে না।'

মুচকি হেসে জবাব দিল কাকা, 'ঐ নম্বরের মধ্যেই তো লুকোনো ছিল ডেভিসের ঠিকানা।'

'তার মানে—' শিরীষ পাল হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

'খুব সহজ ব্যাপার। ০১৬৮৫১৩২ এই সংখ্যাটা উলটে দিলে অযোধ্যা পাহাড়ের অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ পাওয়া যাবে। কি মজা দেখুন, সংখ্যাটা উলটে দিলে ২৩১৫৮৬১০ অর্থাৎ ২৩০১৫´ আর ৮৬০১০´। আর এটাই হলো অযোধ্যা পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ ডেভিসেরও ভৌগোলিক অবস্থান। আমাদের শাসানি দিয়ে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল, তার সংখ্যাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে উত্তর পেয়ে যাই। তারপর একটু ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে।'

কাকার কথা শেষ হওয়া মাত্র শিরীষ পাল বললেন, 'ধন্যি মশাই আপনার মাথা।'

কাকার কৃতিত্বে গর্বে আমারও বুক ফুলে উঠছিল।

সূর্যকাকা বললেন, 'থ্যাংক ইউ সৃজন।'

আমরা সবাই ফিরে তাকালাম সূর্যকাকার দিকে।

টেলেক্স মেসেজে সূর্যকাকার কাহিনী কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। খবর পেলাম সায়েন্স সোসাইটির তরফ থেকে সূর্যকাকার জন্য কলকাতায় বিরাট সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু সূর্যকাকার মুখে হাসি নেই। চারিদিকের আনন্দ কলরোলের মধ্যে বসে

galpochhabi.blogspot.in

ভাবছেন বিজ্ঞানী উইসমূলার ও পার্থসারথির কথা, যাঁরা ওরই সঙ্গে বেসমেণ্টের অন্য ঘরে বন্দী ছিলেন। ওঁরা বোধহয় আর বেঁচে নেই। তাছাড়া ইউ ২৩৩-এর ফরমূলা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো। কত শতাব্দী পরে কোন বিজ্ঞানী আবার সেটা আবিষ্কার করবেন কে জানে!

রুমাল বার করে নিজের চোখ মুছলেন সূর্যকাকা।

॥ শেষ ॥

galporchhabi.blogspot.in